মণিমালা

মণিমালা

লীলা মজুমদার



এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী ॥ কলিকাতা-সাত

॥ প্রকাশক ॥
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

॥ প্রচ্ছদপট ॥
মণীন্দ্র মিত্র

॥ বাঁধাই ॥
আলম এণ্ড কোং

*

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৩

দাম—২॥০

সু, কু, ম-কে——

লেখিকার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

মনিকুন্তলা

শ্রীমতি

জোনাকি

এক

মণিমালা বলে আমার একটি নাত্‌নী আছে, সাদামাটা তার চেহারা, বাঙ্গালীর ঘরে আর পাঁচজনার যেমন হয়, আর পাঁচ-জনারই মত সাদাসিধে তার মন, অসাধারণ বা অস্বাভাবিক তার কোথাও কিছু নেই। আর সকলের মেয়ের মত স্কুলে যায় আসে, বিকেলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলো করে, বাড়িতে পোষা বেড়াল আছে, কুকুর আছে, এক কথায় আমার নাত্‌নী মণিমালা অতিশয় সাধারণ মেয়ে।

ঐ মণিমালার বারো বছর বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনটা যে কত রকমের সমস্যা দিয়ে বোঝাই হয়ে গেল, মণিমালার মুখে সে সব কথা যে না শুনেছে, তার পক্ষে ধারণা করাই অসম্ভব। কে না জানে যে দাদা দিদি কাকা মামা মাসি পিসি মা বাবারা কেমন যেন হয়, তাদের সব কথা সব সময়ে খুলে বলা যায় না। একটু কিছু বল্লেই, সবাই মিলে "ঐ দেখ! কেন করলি, কবে করলি, কোথায়, কতখানি, কী জন্য" ক'রে ক'রে কান ঝালাপালা ক'রে দেবে। কিন্তু ঠাকুমা দিদিমারা হয় নিজের লোক, তাদের কাছে মনের কথা ঝেড়েঝুড়ে বলা যায়, ভুল বুঝ্‌বারও ভয় থাকে না, বকাবকি করবারও ইচ্ছা থাকে না। অনেকটা সমবয়সীর মত। এই সব কারণে মণিমালার সঙ্গে আমার চিরকাল রাশি রাশি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়, এমন সব চিঠি যা পড়লে ওর বাবা মা অবাক্ হয়ে যেতেন।

এই সময়ে, ওর বয়স তখন প্রায় বছর বারো হবে, মণিমালার একখানি চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

তোমার চিঠি পড়ে তোমার অবস্থাটা কতকটা আঁচ করে নিতে পেরেছি। রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাড়িতে কী হয় তার কতকটা কতকটা আন্দাজে বল্‌ছি শোন।

বোধ হয় রাস্তায় আলো জ্বালবার পর তুমি মেয়েদের ক্লাব থেকে ফেরো আর সেইজন্য বাড়ির লোকেরা মোটে খুসি হয় না। তুমি এসে ঘরে ঢোক, পায়ে কাদা, জুতো আবার ছেঁড়া, হাঁটুর কাছটা কাটা, বাঘার চেন্ হারিয়ে ফেলেছ শুনেছিলাম, তার গলায় নিশ্চয় নারকোলের দড়ি বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে সঙ্গে নিয়ে আসো। যাবার সময় তার খুব ফূর্তি ছিল, ততক্ষণে বোধ হয় তার জিভ্ ঝুলে পড়েছে।

যেই না বস্‌বার ঘরে পা দিয়েছ তোমার জ্যেঠিমা বলেন: ঐ এতক্ষণে এলেন ধিঙ্গী মেয়ে পাড়া বেড়িয়ে, এখন থেকে যদি শাসন না কর, নলিনী, এই মেয়ের জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে বলে রাখ্‌লাম! মাও বলেন: তা আর আমি জানি না? এখন বড় হচ্ছিস্, মণি, এইরকম পাড়াময় টোঁটোঁ করা! ছাড়্ আর চুলগুলোকে কী বানিয়েছিস্ বল্ ত? তেলজল দিয়ে একটুখানি টেনেটুনে বিনুনি বাঁধ্‌তে পারিস্ না? এখনও কি আমাদের সব করে দিতে হবে নাকি?

তুমি নিশ্চয় রাগ ক'রে সিঁড়ির উপর বসে পড়—ঐ দেখ,

আচ্ছা ওটা কি বস্‌বার জায়গা হ'ল? এতটা বয়স হ'ল তা' বুদ্ধি হবে কবে? এই সময়ে তোমার মেজপিসি হয় ত' বলে— বাবা! হাঁটুর ছিরি দেখ। আচ্ছা মেজবৌদি, এই পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা বুড়ো মেয়েকে ফ্রক্ পরিয়ে ভালো লাগে দেখতে তোমার?

মা ব্যস্ত হ'য়ে বলেন—না, না, ভাই, এই তেরো বছর পূরে গেলেই শাড়ি ধরাব, আর কটা দিন একটু দৌড়ঝাঁপ করুক্ না।

তুমি এইখানে বাবার পিঠে মুখ গুঁজে গোঁ গোঁ ক'রে নিশ্চয় বল—আমি শাড়ি পরব না। কাকীমারা তখন বলেন—ভারী বেয়াড়া মেয়ে, যাই বল। আমরা ওর কত আগে শাড়ি ধরেছি, উনি ভারী খুকী হয়েছেন। একটা আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখ্ না কেমন দেখায়, তারপর বলিস্। তাছাড়া এখন আর বিকেলে ঐরকম একদল মেয়ের সঙ্গে হা হা ক'রে বেড়ানো ভালো দেখায় না, মেজদি, ভালো চাও ত' ঐটে বন্ধ কর।

এবার তুমি বোধ হয় ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলে, সিঁড়ি থেকে উঠে দৌড় মার। কেমন দিদিমণি, তোমার সন্ধ্যেটা প্রায়ই এই রকম ক'রে কাটে না আজকাল? আসল কথা হ'ল, তুমি যে বড় হয়েছ একথা তুমি ছাড়া আর সবাই ঠিক ক'রে ফেলেছে। এখন তুমি তোমার লম্বা হাতপা ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল আর ছিঁচ্‌কাঁদুনে স্বভাব নিয়ে যাবে কোথায়?

কিছু ভয় নেই, দিদিমণি। আমাদেরও একদিন বারো বছর বয়স ছিল, তখন আমাদের আরও আগে বুড়া বানানো হ'ত। আরে, আমার বড়দিকে শুনেছি, তার বিয়ের দিন, পেয়ারা গাছ থেকে নামিয়ে এনে কনে সাজানো হয়েছিল। তুমি নির্ভয়ে তোমার পড়াশুনো খেলাধূলো নিয়ে থাকো। তবে কি জান,

একটু বড়সড় হ'লে বাইরের একটা গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে মানায় বলে ঐ এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে বেশী হৈ-চৈ না করলেই ভালো।

আর ফ্রক্ এখুনি ছাড়াবার কোনও দরকার দেখি না, তোমার মা'কেও এ বিষয় লিখ্‌ব। এখন না হয় কারো বাড়িতে টাড়িতে যেতে শাড়ি প'রে যেও, আর খেলাধূলোর সময় ফ্রক্ প'র। না হয় তলার সেলাইটা খুলে একটু লম্বা ক'রে নিও। আর দিদিমণি, তোমার লম্বা লম্বা পা আর হাঁটু নিয়ে কিছুমাত্র লজ্জিত হ'য়ো না, তোমার জোরালো হাত পা দেখ্‌তে আমার বেশ ভালোই লাগে।

তবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের সবাই কিন্তু খুব সুবিধের নয়। ঐ যে দুটো মেয়ে আসে, আলি ভুলি না কী যেন নাম, ওদের কি তোমার সত্যি খুব ভালো লাগে? ভদ্রলোকের মেয়ের ভদ্র ব্যবহার হবে, কথাবার্তার একটা ছিরি থাক্‌বে, চেহারার একটা শীলতা থাক্‌বে, চলাফেরার একটা গাম্ভীর্য থাক্‌বে, নইলে আর শিক্ষা হল কী? ঐ রকম এ ওর গায়ে ঢলে প'ড়ে, হ্যা হ্যা করতে করতে পথ চল্‌তে ওদের মানা কর। তোমার জ্যেঠি খুড়িরা যা বলেন, সবটার সঙ্গে আমার মত না মিল্‌লেও, একটু বড় হ'লে মেয়েদের যে চলাফেরা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত এ কথা সত্যি।

তাই বলে খেলা ছেড়ো না, ক্লাবের মাঠে খেল্‌বে বৈ কি। তার পর সোজা বাড়ি এসে, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। ব্যস্, কারো কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না।

এবার পূজোর ছুটিতে দিহুর বাড়িতে আস্‌বে নাকি? আমার বেড়ালের চারটে বাচ্চা হয়েছে দেখ্‌বে না?

অনেক আদর নিও। ইতি।

এই চিঠিখানি শুনে নিশ্চয় কারো আর বুঝতে বাকী নেই যে মণিমালার চিঠিতে ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ থাকে। ওর জীবনে কত রকম সমস্যা তার লেখাযোখা নেই। পুতুল-খেলা নিয়ে যে কত রকম প্রশ্ন উঠতে পারে কে কল্পনা করতে পারত? তাই আরেকখানি চিঠিতে লিখি।

স্নেহের মণি,

খেঁদি বুঁচির দুঃখে আমারই বুক ফেটে যাচ্ছে, তা খেঁদি বুঁচির ন্যাক্ড়া দিয়ে সেলাই করা বুকের মধ্যে কী হচ্ছে কে জানে!

গত বছর তোমার জন্মদিনের আগে কত কায়দা করেই না আমার কাছ থেকে খেঁদি বুঁচিকে আদায় করেছিলে, আর এক বছর পর ওদের খবরের কাগজে মুড়ে আল্‌মারির মাথায় তুলেছ?

কে ওদের কাপড় ছাড়াবে শুনি? ওদের জন্য পুঁতির মালাও বোধ হয় গাঁথা হবে না? এ গ্রীষ্মকালে ছুটির সময়ে আর বোধ হয় গরম জামা বুনে পরানো হবে না?

না: রাগে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। পুতুল খেল্‌তে ইচ্ছা করে, অথচ পাশের বাড়ির রুনু টুনুরা পাছে ঠাট্টা করে এই ভয়ে বেচারী খেঁদিবুঁচিরা আল্‌মারির মাথায় তোলা থাক্‌বে?

না, আমি নিজের হাতে সাত নম্বরের ছুঁচ দিয়ে ওদের পেট সেলাই করেছি, লাল কালি, কালো কালি দিয়ে ওদের চোখ মুখ এঁকেছি, কালো মোজার বোনা খুলে ওদের কোঁক্ড়া চুল বানিয়েছি, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। হয় তুমি ওদের বের করে, প্রকাশ্যভাবে যত দিন তোমার ইচ্ছা হয় খেলা করবে।

নয় ত' এখুনি ওদের মিণ্টুকে দান করবে। ভেতরে ভেতরে ইচ্ছা, বাইরে ঠাট্টার ভয়, এমন দুর্বল তুমি কিছুতেই হ'তে পারবে না।

পুতুল খেলাতে কোনও দোষ নেই। পুতুল খেলা যদি খুকীমি হয়, লুডো কিনেছ যে, লুডো খেলাতে কী পাকা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বল ত? নাঃ, পুতুল খেলা নিয়ে যে আবার একটা সমস্যা উঠ্‌তে পারে এ আমি মানবই না।

কী স্থির করলে পত্রপাঠ জানাবে। অনেক ভালোবাসা নেবে। ইতি।

মণিমালার যখন তেরো বছর পূর্ণ হ'ল, তখন তাকে আবার চিঠি লিখেছিলাম। বলা বাহুল্য এতদিনে তা'র বড় হওয়ার ব্যাপারটা বেশ পাকিয়ে এসেছে, সে সর্বদা একটা ঝড়ের মধ্যে বাস করে, তার রাগটাগগুলো সবাই দেখতে পায়, মনের মাঝের ভাবনাচিন্তাগুলোর কেউ বড় একটা ধার ধারে না, কাজেই শেষটা আবার ঠাকুমার কাছে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে হয়। সে যাই হোক্, আমার চিঠিখানি পড়ুন।

স্নেহের মণিমালা,

আমার সেদিনকার সেই ছোট দিদিমণির তেরো বছরের জন্মদিনে তা'র বুড়ো ঠাকু'মা অনেক অনেক ভালোবাসা আর এই ছোট বাক্সখানি পাঠাচ্ছে। বাক্স খুলে একখানি লাল মারাঠি

শাড়ি পাবে। সবুজ মারাঠি চোলি পাবে, ওদিক্‌কার গ্রামের লোকের হাতের তৈরী, কারিকুরি কাজ করা রূপোর বালা আর কণ্ঠি পাবে।

বুঝ্‌তেই পারছ, উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে দিদিমণির বড় হওয়াটা দিদু মেনে নিচ্ছে।

এই সঙ্গে এ বাড়ির সবাই মিলে এই ইচ্ছা জানিয়েছে যে দিদিমণি এবার খুকীমির বয়স পার হয়ে কৈশোরে পা দিল, এখন থেকেই যেন দিশী জিনিস যেখানে যা ভালো আছে, তাকে ভালোবাসতে শেখে।

তাই বলে যেন আবার বিদেশী জিনিস ভালো হ'লেও তার অনাদর করো না। যে যাই বলুক, ভালো জিনিসকে সর্বদা ভালো ব'লে স্বীকার করতে হয়। তুমি লিখেছ তোমার আগে যা' ভালো লাগ্‌ত এখন ভালো লাগে না, আগে যাদের সঙ্গে ভাব ছিল এখন আর তাদের সকলের সঙ্গে ভাব নেই, এই জন্য মন খারাপ লাগে। মন খারাপ লাগ্‌বে কেন, এখন তোমার নিজের পছন্দ, নিজের রুচি ব'লে একটি জিনিস গড়ে উঠ্‌ছে, আগেকার ভালো লাগাগুলো তাই সব টিক্‌ছে না। কিন্তু সত্যিকারের ভালো জিনিস চিরকাল ভালো থাকে, আর সত্যিকার বন্ধুদের যতদিন বেঁচে থাকা যায় মাথায় ক'রে রাখ্‌তে হয়।

তা' হ'লে সত্যি সত্যি এবার শাড়ি ধরলে? তবে খেলার জন্য ক'খানা ফ্রক রেখেছ শুনে খুসি হ'লাম। তোমার মা'কেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না ভাই। শাড়ি পরা মানেই যে তোমার খেলা-ধূলো, দৌড়ঝাঁপ, গাছে চড়া আর মাঠে বেড়ানো, সব কিছুতেই বাধা পড়া, এ কথা তিনি বেশ জানেন। সত্যি কি আর তাঁর ছোট মেয়েটিকে বুড়ো বানাতে তাঁর ভালো লাগ্‌ছে? তবে কী জান

দিদিমণি, আলোচনার পাত্রী হবার মত মনের জোর এ তুনিয়াতে ক'জনারই বা থাকে ? তুমি দিনকে দিন যে রকম তালগাছটির মত শোভা ধারণ করছ, পাড়ার লোকে যে তাঁর কান তুটিতে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

তোমার নালিশগুলোর সার মর্মটা আমি ঠিকই বুঝেছি। তোমার বয়সটা বাড়তে বাড়তে আস্তে আস্তে তোমাকে যে বুড়োদের দলে এনে ফেল্‌ছে, এতে তোমার মত নেই, এই ত ? তোমার বেলা এই ব্যবস্থা, আবার অন্যদিকে তোমাদের বাড়ির গুপীটাকে দেখ, বয়সে তোমার চেয়ে এক বছরের বড়, তবু ক্যায়সা খোকামী ক'রে বেড়াচ্ছে. কেউ কোনও আপত্তি করছে না। অথচ কোথাও হেঁটে যেতে হ'লে তোমাকে একা যেতে দেবে না, ঐ গুপীটাকেই হয় ত' সঙ্গে দিয়ে দেবে। রাগে বোধ হয় তোমার গা জ্বলে যায় ? শুনেছি গুপীটা নাকি আবার রাস্তায় লোকের বাড়ির গাছ থেকে ফুলটুল পাড়ে, বকাবকি হয়। বাস্তবিক পাহারাওয়ালা হিসাবে গুপীটার গুণের আর অন্ত নেই। মনে নেই সেবার সামনে গোরু দেখে আমাদের ফেলে টেলে একেবারে পগার পার ! ওর কাছ থেকে তুমি যে খুব প্রোটেক্সন্ পাবে একথা আমারও মনে হয় না। তবে সেজন্য ত' ওকে সঙ্গে দেওয়া হয় না, সবাই জানে যে সারা রাস্তা তুমিই ওকে আগ্‌লে নিয়ে যাবে। ওকে সঙ্গে দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশের সব লোকেরা এখনও মেয়েদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে শেখে নি। তুমি একা গেলে হয় ত' নানাভাবে বিরক্ত করবে অথচ গুপী থাক্‌লে কেউ কিছু বল্‌বে না। রাগও ধরে আবার হাসিও পায়।

ঐ লোক সঙ্গে নিয়ে হাঁটার কথা বল্‌তে মনে হ'ল যে দশ বছর পরে যা'তে আমাদের মেয়েরাও অন্য দেশের মেয়েদের মত

নিরাপদে ও নির্ভীক্‌ভাবে একলা পথ চল্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর। শরীরটাকে শক্ত বানাও, যা'তে দরকার হ'লে দু'চার ঘা লাগিয়ে দিতে পার। আর তার চেয়েও বড় কথা মনটাকেও সাহসী কর, যা'তে ভয়কে ভয় না কর। কিন্তু সর্বদা সতর্ক থেকো সাবধান থেকো।

তোমার এই বয়সটাই হ'ল মুস্কিলের। এদিকে বুড়ীদের অসুবিধাগুলো সব ভোগ করতে হচ্ছে, ওদিকে সুবিধাও ত' আছে, সেগুলোর বেলা বাদ পড়ে যাচ্ছ। মা কাকীমারা গোল হয়ে বসে যখন গল্প জোড়েন তখন 'এই মণি, ভাগ্‌, এখান থেকে।' 'দেখ, দেখ, কেমন উৎশৃঙ্গ হ'য়ে শুন্‌ছে দেখ, পালা বল্‌ছি!' 'তোর কি কোন কাজকর্ম নেই যে বসে বসে শুধু জ্যাঠামো শিখ্‌ছিস্‌?' এই রকম। আবার যদি রুবি-বিবির দলে ব'সে পুতুল খেল, 'আরে, ইনি যে আবার শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুক্‌তে এসেছেন।' 'হ্যাঁরে, এত বড় হ'লি আবার ওদের সঙ্গে লাগতে এসেছিস্‌ যে, তোর লজ্জা করে না'—সবই জানি দিদিমণি, কী করবে বল? এবার এক কাজ কর, আস্তে আস্তে, যা'তে কেউ টের না পায়, প্রতি বছরে এক বছর ক'রে বয়সটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে, শেষটা সত্যি বড় হ'য়ে ওদের সব্বাইকে জব্দ ক'রে দিও ত'। ঠিক হবে।

অনেক আদর নিও। উত্তর দিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

দুই

মণিমালাকে যে সব হাজার হাজার চিঠি লিখেছি তার আরও দু'একখানি খুঁজে পেয়েছি, এগুলি তার তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে তা'কে লিখেছিলাম।

স্নেহের দিদিমণি—

তা হ'লে আমাকে কি এই কথা বুঝতে হ'বে, যে দুনিয়ার কোনও কিছুই তোমার আজকাল আর ভালো লাগছে না? এ কি একটা কথার মত কথা হ'ল? তেরো চোদ্দ বছর বয়স ত' সবারই হয়, তার মধ্যে আর বিশেষত্ব কোথায় আছে? তোমার বয়স বাড়বে, উপরের ক্লাশে উঠবে, নতুন নতুন বিষয় শিখবে, বুদ্ধি বাড়বে, সব হ'বে আর শরীরটা বাড়বে না?

তুমিই বল দিদিমণি, যার যা বয়স সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিশুদ্ধি, ধরণধারণ, শরীরের পরিণতি সবটারই কি সামঞ্জস্য থাকা উচিত নয়? এর মধ্যে কোনও একটার পেছিয়ে পড়াটা ত' আর কিছু বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। সব দিক দিয়ে নিজের বয়সের উপযুক্ত হ'তে হবে। তার মধ্যে যেমন কোনও বাহাদুরিও নেই, তেমনি কোনও লজ্জার বিষয়ও নেই।

একজন সুস্থ স্বাভাবিক তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ের যেমনভাবে

বাড়া উচিত, তুমি যদি তা না বাড়ো তা' হলেই চিন্তার কারণ হ'বে। প্রকৃতির নিয়মগুলি নিখুঁৎ সুন্দর, আমাদের নিয়মেই যত গলদ্। তোমার স্বাস্থ্য ও শরীর যদি চিরকাল প্রকৃতির আদর্শের অনুযায়ী হয়ে চলে তার মধ্যে বিব্রত হ'য়ে পড়বার কিছুই নেই, কিন্তু গৌরব বোধ করবার অনেক কারণ আছে।

অতএব যেমন একদিক্ দিয়ে লেখাপড়া শিখে, সাহস সংযম দিয়ে মনটাকে আমাদের এই এত কষ্টের স্বাধীনতার উপযোগী করে তুলতে হবে, তেমনি নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা করে, শরীরের সমস্ত শক্তিকে বিকশিত করে, তোমার মাটির দেহটাকেও দেশের মাটির যোগ্য করে তুলো।

আশা করি এর পরের চিঠিতে শুনব তুমি হাস্‌ছ, খেল্‌ছ, পড়ছ, কাজ করছ, আর ছুনিয়াটাকে আবার একটু একটু ভালো লাগছে।

ভালোবাসা নিও। ইতি—

পুঃ—ছুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, চল্লিশ বছর আগে আমারও তোমার যেমন মনে হয় সেই রকম হ'ত মাঝে মাঝে।

কত বিষয়ে যে মণিমালার সঙ্গে আলোচনা হ'ত তার আর লেখাযোখা নেই, আর একবার লিখলাম।

স্নেহের মণিমালা,

তোমার মামিমার এবকম গুরুতর অসুখের কথা শুনে,

কত যে দুঃখিত হয়েছি বল্‌তে পারি না। যাই হোক্‌, এতদিন পরে যে তার একটা ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, এটুকুই আশার বিষয়। তবে সত্যি কথা বল্‌তে কি, এই ব্যাপারে তোমার যতটা সহানুভূতি আছে, আমার সম-বেদনা থাক্‌লেও অতটা সহানুভূতি নেই। আশা করি দুটোর তফাৎ বুঝ্‌তে পারলে? তিনি কষ্ট পাচ্ছেন বলে আমার খারাপ লাগ্‌ছে এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি শীঘ্র সেরে উঠুন, কিন্তু রোগের সূত্রপাত থেকে এতদিন পর্যন্ত বাড়ির লোকের কাছ থেকে নিজের অসুখ ও কষ্টের কথা গোপন ক'রে তিনি যে ধৈর্যের ও স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দিয়েছেন এ কথা আমি মানি না। প্রথম থেকেই যদি তিনি তোমার মামাকে ব লে চিকিৎসা করাতেন, রোগটা এতদূর গড়াত না, এত দুশ্চিন্তার কারণও হ'ত না, এত অর্থব্যয়ও হ'ত না। তুমি লিখেছ যে তোমার ওরকম অসুখ হ'লে ঐ রকম নীরবে সহ্য করবার ক্ষমতা কী করে লাভ করা যায়, এইটে তুমি শিখ্‌তে চাও। হ্যাঁ, যেটুকু কষ্টভোগ আছে সেটুকু যেন নীরবে সইতে পার, এ ইচ্ছা ভালো, এবং মনের জোর করলেই অনেকটা পারা যায়। কিন্তু রোগ সম্বন্ধে যেন নীরব থেকো না। ডাক্তারদেরও একটা চান্স দিও। একে স্বার্থপরতা বলে না, বরং এটা একটা কর্তব্য।

গতবার যে বল্‌ছিলাম সকল অবস্থাতেই, সব দিক দিয়ে, সুস্থ থেকে নিজের কাজ করা উচিত, এও সেই পুরোন কথাই। বিশেষ করে, বাড়ির গিন্নীরা যাঁদের উপর গোটা সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা নির্ভর করে তাঁদের ত' শরীর ভালো রাখ্‌তেই হ'বে। আর সেই একই কারণে তোমাদের মত ছেলেমানুষদেরও শরীরের স্বাভাবিক নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হ'লে, তখুনি তার চিকিৎসা করা দরকার। নইলে কর্তব্যের হানি

করা হয়। তুমি লিখেছ যে তোমার মা'র সব কথা শুন্‌বার সময় হয় না, সব সময়ে মনে রাখ্‌বে যে ঠাকু'মার হাতে কিন্তু দেদার সময় আছে। ভালোবাসা নিও। ইতি—

মণিমালাকে লেখা এই সব চিঠি পড়তে পড়তে অনেক পুরোন কথা মনে পড়ে যায়, বারো বছর আগে মণিমালার যখন তেরো বছর বয়স ছিল তখনকার ওর সব ছোট ছোট সমস্যার বিরাট পর্বত আর তারও চল্লিশ বছর আগে, আমার যখন বারো বছর বয়স ছিল, তখনকার আমার সব ছোট ছোট সমস্যার গন্ধমাদনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই। প্রভেদ এই যে আমার ঠাকু'মা সেকেলে ছিলেন বলে তাঁকে সোহাগের কথা ছাড়া আর বড় একটা কিছু লেখা যেত না, মণিমালার ঠাকু'মা তার চেয়ে আধুনিক ঠাকু'মা বলে সে অকপটচিত্তে সব কথা খুলে বল্‌তে পারে। তাছাড়া তখনকার দিনে আমাদের কেমন একটা ধারণা জন্মে দেওয়া হয়েছিল যে নিজের দেহটা একটা ঢেকে রাখবার, গোপন করে রাখ্‌বার, এবং অতিশয় লজ্জার বিষয়, যা'কে নিয়ে আলোচনা করা, অথবা কোনও রকম কৌতূহল প্রকাশ করা অতিশয় নিন্দনীয় ব্যাপার। তার ফলে আমরা আনাচে কানাচে বই ঘেঁটে, এবং সর্বদা চোখ কান খুলে রেখে অসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করতাম।

একবার লজ্জার মাথা খেয়ে আমার ছোট পিসিমাকে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম তিনি আমার ফ্রেণ্ড্, মাত্র দশ

বছরের বড়, তাঁর কাছে একটা সঠিক উত্তর পাওয়া যেতেও পারে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

স্নেহের খুকু,

তোমার চিঠি পড়িয়া অবাক্ হইয়াছি, তোমার নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক চিত্তে যে এরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারে ভাবিয়া হতাশ হইতেছি। মনকে পবিত্র কর, ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিবেন।···ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কী, ভগবানকে হাজারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি যখন কোনও সাড়া দিলেন না, তখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। বহুকাল পরে যখন মণিমালার মনে আবার ঐ সব পুরোন প্রশ্ন জেগেছিল, আমি অকপট চিত্তে তার সমস্ত কৌতূহল নিবৃত্ত করবার বহু চেষ্টা করেছি।

মণিমালাকে লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

না, দিদিমণি, তোমার প্রশ্নগুলি শুনে আমি একটুও বিচলিত হই নি, অসন্তুষ্ট ও হই নি, বরং খুসি হয়েছি। কারণ যারই বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে সেই যে সব কিছুর কারণ অনুসন্ধান করবে এ ত' স্বাভাবিক। তোমার মা অকারণ লজ্জাবশতঃ যে সব প্রশ্নের উত্তর দেন নি, এই সঙ্গে বুক পোষ্টে তোমাকে যে ইংরিজি বইটি

পাঠালাম, তার মধ্যে সহজ ভাষায়, বৈজ্ঞানিক অথচ সরল ভাবে তোমার সব সমস্যার সমাধান পাবে, এবং তার চেয়ে ও বেশী পাবে। এটাকে মন দিয়ে পড়ে দেখো। পরে মা'কেও দিও। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার মত যখন তোমার বয়স হয়েছে, প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বার মতও তখন বয়স হয়েছে। কাজেই বিরক্ত হই নি, আমার বুদ্ধিমতী দিদিমণির উপর খুশি হয়েছি।

গুপীর কি খবর? তুমি ত' দিনে দিনে বড়দের দলে যোগ দেবার চেষ্টায় আছ। ফ্রক্‌ ছেড়েছ, পুতুল তুলেছ, গাছে চড়া ছেড়েছ। তার কী অবস্থা? সাক্ষাৎ তোমার দাদা, তার বাঁদুরে ভাবটাবগুলো একেবারে ঘুচেছে, এমন বোধ হয় আশা করা যায় না! কিছুদিন সবুর কর দিদিমণি, মেয়েরা শীগ্‌গির বেড়ে যায়, কিন্তু ওর বয়সও বসে নেই, ওকেও একদিন বড় হ'তে হ'বে। ঐ গাছে ঝুলে ভেংচি কাটা বন্ধ করে, দাড়ি কামিয়ে, ভদ্রলোক হ'তে হবে। আর দুটো বছর ওকে সময় দাও না।

আশা করি তুমি একেবারে বুড়ি বনে যাও নি? গাছে না হয় না চড়লে, কিন্তু ক্লাবে ব্যাড্‌মিন্টন খেল নিশ্চয়? একটু খেলা-ধূলোর চর্চ্চা রেখো।

ভাব্‌ছি পূজোর ছুটিতে তোমাদের কাছে যাব তাই তোমাদের ক্লাবের প্রোগ্র্যাম ট্রোগ্র্যাম নিশ্চয় জানিও। গতবারের মত ছোট নাটক ছাড়াও এবার দু'একটা ব্রতচারী নাচের ব্যবস্থা কর না কেন। দেখতেও চমৎকার লাগে আর খাসা একসারসাইজ হয়।

সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। ভালোবাসা নিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

মণিমালার চোদ্দ বছরের জন্মদিনে লিখেছিলাম।

স্নেহের দিদিমণি,

তোমার ছোট কাকার হাতে বুড়ো ঠাকু'মার উপহারগুলি কেমন লাগ্‌ল নিশ্চয় জানাবে। গত বছর শাড়ি গহনা দিয়েছিলাম এ বছর কেবল রাশি রাশি বই পাঠালাম, তাও সব পুরোন বই। দিদিমণির কি একটু দুঃখ হ'ল? মাকে বলেছিলাম নীল রংয়ের ঢাকাই সাড়ি কিনে দিতে।

বইগুলি ভালো করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে ও গুলো ঠাকু'মার বড় আদরের জিনিস, বহু বছর বড় যত্ন করে তুলে রাখা। সব প'ড়, তোমার মা খুড়িরাও আপত্তি করবেন না, আমিও তোমার বয়স থেকে এগুলোকে সংগ্রহ করেছিলাম।

দিদিমণি, আশীর্বাদ করি তুমি আমাদের দেশের যোগ্যা হও, তোমার দেহের শক্তি ও সামর্থ্য আর মনের বল ও জ্ঞান, নিয়তই বেড়ে যাক্। শুন্‌লাম তোমাকে চোদ্দ বছরের না দেখিয়ে কুড়ি বছরের বলে ভুল হয়। তাই নিয়ে বাড়ির লোকে নানান্ কথা বল্‌লে তুমি কাঁদ? শুনে রাগে ঠাকু'মার গা জ্বলে যাচ্ছে। শরীরটা যদি বেড়েই গিয়ে থাকে সে ত' ভালো কথা। এবার ওকে গড়ে পিটে শক্ত কর, শিখিয়ে পড়িয়ে সুন্দর কর। একটা সবল সুস্থ শরীর প্রকৃতির আশীর্বাদের মত, তাই নিয়ে কাঁদ্‌তে হয় না, আরেকদিন বলেছিলাম না যে গৌরব বোধ করতে হয়? চিম্‌ড়ে, রোগা, অপরিণত শরীর দিয়ে তুমি দেশের কাজ কেমন করে করতে বলতো? আমাদের এখন মনে করতে হবে আমরা ভারতের মেয়ে, আমাদের দেহমনকে ভারতের কাজে লাগাতে

হবে। নিন্দামান্দায় আমাদের এসে যাবে না। তুমি কাঁদো, মাণিক? ছিঃ, আমার ত' তোমার কথা মনে করে গর্ব হয়। আমি যা কিছুই পারলাম না আমার নাতনী তার বাহুবল দিয়ে, বুদ্ধি-বল দিয়ে তাই সম্পন্ন করবে।

তোমার দুই বন্ধু আলি-ভুলির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে লিখেছ, তাই তাদের মা বুঝি মহা খুসি হয়ে তোমাদের আম আর সন্দেশ খাইয়েছেন?

তুমি যাই বল আলি-ভুলিদের শ্বশুর বাড়ির লোকদের জন্য আমার বিষম সহানুভূতি হচ্ছে। পোষ মানিয়ে নেবে নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু নিজেরা কিছুই শিখ্‌ল না, স্বাস্থ্যটাকে পর্যন্ত ভালো করল না, শুনেছিলাম একজনার কোনও রকম কাজ করলেই হাঁপানিতে ধরে, আরেকজনার ফিটের রোগ আছে—এরা এখন সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কী করবে, তাই ভাবনা হচ্ছে। এদের ছেলেপুলেদেরই বা কী রকম স্বাস্থ্য হবে কে জানে।

জানো দিদিমণি, আমাদের সময় যত সব উপন্যাস লেখা হ'ত, তার অধিকাংশেরই নায়িকারা যক্ষ্মা কি ঐ ধরণের একটা রোগে অনেকদিন ভুগে ভুগে মারা যেত। আর সবাই কেঁদে বলত—আহা, কি রোম্যান্টিক্! তোমাদের দেহে সিংহীর মত শক্তি ও সাহস হোক, কিন্তু তোমাদের মন ফুলের মত কোমল হোক, তা' হ'লে দেখবে তোমাদের জীবনে রূপরসের অভাব হবে না। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

তিন

পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের মত আমার নাতনী মণিমালাও মেয়েদের হাইস্কুলে পড়তে যেত। সেখানকার দিদিমণিদের সঙ্গে দেখতাম মণিমালার মা-খুড়িদের নিরন্তর বিরোধ লেগে থাক্‌ত। মণিমালার কথায় মনে হ'ত দিদিমণিরা দেখতেও যেমন পরমা-সুন্দরী, তেম্‌নি গুণেরও আধার। আর তাঁদের চলনবলন সাজসজ্জা দেখলে নাকি মা-খুড়িদের চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে। মা-খুড়িরাই বা ছাড়বার পাত্রী হবেন কেন? কী এমন কেউকেটা শুনি ইস্কুলের দিদিমণিরা? আমাদেরই মত গেরস্থ ঘরের মেয়ে ত', কেউ ওঁদের বিয়ে করতে রাজী হয় নি, আর আমাদের গলায় রেষারেষি ক'রে আগ্রহের সঙ্গে সব মালা দিয়েছে, এই যা তফাৎ। বি-এ, এম-এ পাশ? কালো কুচ্ছিৎ হ'তাম, কেউ বিয়ে-থা' না করত, আমরাও অমন ঢের ঢের বি-এ এম-এ পাশ করতাম, কেমন না মেজদি?

মনের দুঃখে মণিমালা আমাকে চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিল। নাকি অন্য দিদিমণিদের কথায় অতটা মনে কষ্ট না লাগলেও লাবণ্য-দিদির অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কারো মনে যে কোনও রকম সন্দেহও হ'তে পারে, এ মণিমালা ভাবতে পারে না। মা-কাকিমারা লাবণ্য-দিদিকে না দেখেই তাঁর সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করলে মণিমালা কেমন ক'রে সহ্য করবে?

এই চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম :

স্নেহের দিদিমণি,

তোমার বর্তমান সমস্যার একটা সহজ সমাধান হ'য়ে যায়, যদি একদিন বিকেল বেলায় লাবণ্যদিদিকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে পার। তোমার মা-কাকিমারা যখন নিজেদের চোখে দেখবেন লাবণ্যদিদি কেমন সুন্দর দেখতে, কেমন পরিপাটি পছন্দসই কাপড়চোপড় পরেন, কেমন মিষ্টি ব্যবহার, কেমন বিদুষীর মত কথাবার্তা, অথচ একটুও অহঙ্কার নেই,—নিজেদের চোখে যখন এই সব দেখবেন, তখন আর লাবণ্যদিদিকে ভালোবেসে না ফেলে থাকৃতে পারবেন না।

তার উপর যখন তাঁরা দেখবেন যে তাঁরাও যেমন তোমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন, লাবণ্যদিদিও তাই করেন, তখন ত' কোনও ভাবনাই থাকৃবে না।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, দিদিমণি, রাগ কর আর যাই কর, দোষটা কিন্তু তোমারই। তুমি যদি পদে পদে দিদিমণিদের সঙ্গে কাকিমাদের তুলনা ক'রে বার বার প্রমাণ করতে চেষ্টা কর, যে দিদিমণিরা অতিশয় শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না, আর বাড়ির লোকরা আনাড়ি ও ভেতো, তাঁদের মনে দিদিমণিদের উপর রাগ ত' হবেই। দিদিমণিদের কাছে গিয়ে তুমি যদি বল—"এ মা! আপনারা আমার মা-কাকিমার মত রাঁধ্‌তে পারেন না, রুগীর সেবা করতে পারেন না, সকালসন্ধ্যে পরের ভাবনা করতে পারেন না, নিজের সুখসুবিধার কথা ছেড়ে দিয়ে সংসারের জন্য খাট্‌তে পারেন না,

এ মা ছিছি !" যদি এই সব রোজ রোজ তাকে বল, স্বয়ং লাবণ্য-দিদিই কি খুব খুসি হবেন ?

দিদিমণিরা ত' মা'দের প্রধান সহায়, আদৌ শত্রু নন্, কাজেই বিরোধের কথা উঠ্‌বে কেন ?

তারপর তুমি যদি আগাগোড়া দিদিমণিদের দিকে টেনে বল, মা'দের মনে একটু দুঃখ না হওয়াটাই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ত। তুমি কি সত্যি মনে কর দিদিমণিরা তোমাকে মা'দের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন ? তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালোবাসেন, কিন্তু রক্তের টান বড় টান, দেখো শেষটা যেন সুদ আদায় করতে গিয়ে আসলটা না হারাও।

এবার তোমার মাও আমাকে এক লম্বা চিঠি লিখে ফেলেছেন, অনেক দুঃখটুঃখও করেছেন। যাই বল ভাই, মা'র মত দুনিয়াতে কেউ হয় না। এটুকু যদি না বুঝে থাকো, তবে আর বুঝ্‌লে কী ? ঐ যে লাবণ্যদিদিকে দিস্তা দিস্তা চিঠি লেখা, ফুলের তোড়া দেওয়া, বইএর মধ্যে তাঁর ছবি রাখা, এগুলো খুব দোষের না হ'লেও, একসঙ্গে করতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায় না কি দিদিমণি ? ইংরিজিতে একটা কথা আছে "ডিগ্‌নিটি", খানিকটা গাম্ভীর্য খানিকটা আত্মসম্মান দিয়ে ডিগ্‌নিটি তৈরী হয়, বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ঐটি যেন হারিয়ো না। আমার ত' মনে হয় সত্যিই যদি লাবণ্যদিদিকে তুমি শ্রদ্ধাভক্তি কর, তা' হ'লে অত ঘটা ক'রে সেটা প্রকাশ করবার কোনও দরকারই হবে না।

ঐ ইস্কুলের ব্যাপার নিয়েই ক্রমাগত মন-কষাকষি হ'তে থাক্‌ল। তবে লাবণ্যদিদিকে চায়ে নেমন্তন্ন করবার পর থেকে মণিমালার মার সঙ্গে তাঁর একটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যের

বিষয় যে তারপর থেকেই মণিমালাও চিঠিপত্র নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করা ছেড়ে দিয়েছিল।

শীতের বন্ধের আগে ইস্কুলের মেয়েরা এক একটা ক্লাশ এক একদিন দু' একজনা টিচার সঙ্গে নিয়ে এখানে ওখানে কাছাকাছি চড়িভাতির আয়োজন করতে লাগ্‌ল। চাঁদাটাঁদা তোলা হচ্ছে, এমন সময় মণিমালাদের বাড়ি থেকে গুরুজনরা প্রবল আপত্তি করতে লাগ্‌লেন, ঐ সব ছেলেমানুষ দিদিমণিদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাওয়াটাওয়া হবে না। আবার আমাকে এই নিয়ে চিঠি লেখা-লিখি করতে হয়েছিল। সেই একখানি চিঠি দেখে মণির মা বাবা কাল হেসে খুন!

স্নেহের মণিমালা,

কে না জানে যে বাড়ির লোকদের মত বেরসিক দুনিয়াতে কেউ নেই; তাদের কাছ থেকে বিশেষ কোন সহানুভূতি বা সহযোগিতা আশাই করা উচিত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের আপত্তিটা কী, সেটা জেনে নিয়ে তারপর তার একটা যা' হয় বিহিত করলে ভালো হয় না?

এই রকম স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া-আসা নিয়ে আমাদের সময়ও বাড়ির লোকেরা গোলমাল করতেন। কে কে সঙ্গে যাবে? কিসে ক'রে যাবে? কোথায় যাবে? কখন ফিরবে? এই ছিল চারটে নিয়মিত প্রশ্ন। ভারী রাগ ধরত। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, এগুলি স্বাভাবিক আর এগুলো জেনে নেওয়া কর্তব্য। তোমাদের পিক্‌নিকে যদি হেড্‌মিষ্ট্রেসের নির্বাচিত

দু'জন টিচার যান ; স্কুলের বাসে, অথবা মেয়েদের চারপাঁচজনার বাড়ির গাড়িতে একসঙ্গে দল বেঁধে যাওয়া হয় ; কাছাকাছি ভালো জায়গাতে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যা হবার আগেই ফেরা যায় ; তা' হ'লে তোমাদের বাড়ির লোকদের আপত্তি হবে আমার মনে হয় না।

যখন তখন যা'র তা'র সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া কিছু কাজের কথা নয়। যখনই যাই কর না কেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে না করলে পরে মুস্কিলে পড়তে হয়।

শুধু পিক্‌নিক্ কেন, বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে গোলমাল হয় না ? আমাদের সময় সে এক মজার ব্যাপার ছিল। বাড়ি থেকে বড় কেউ সঙ্গে না গেলে আমাদের বন্ধুদের বাড়ি যেতে দেওয়া হ'ত না। তাই নিয়ে মেলা লেখালেখি ক'রে, শেষটা দিন ঠিক ক'রে হয় ত' গেলাম, সঙ্গে ছোট পিসিমা গেলেন। বন্ধুরা তাঁকে দেখে আড়ষ্ট, তিনিও ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকান—দু'একবার চেষ্টা ক'রে শেষটা বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে হ'ল। এক যদি আমাদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে ওদের বাড়ির লোকদের চেনাশোনা থাক্‌ত তবে যেতে পেতাম। অবিশ্যি চাকর সঙ্গে যেত, একা যেতাম না।

তোমরা কি কর ? এ বিষয়েও ত' কত রকম তর্কাতর্কি উঠতে পারে। আমার মনে হয় যাদের বিষয় কেউ কিছু জানে না তাদের বাড়িতে না গেলেই ভালো। যা'রা তোমাদের বাড়িতে আসে না তাদের বাড়িতেও না গেলেই ভালো। তোমরা গেলে যারা খুসি হয় না, সে এক আধবার গেলেই টের পাবে, তাদের বাড়িতেও না গেলেই ভালো, আর যাদের তোমার অভিভাবকরা পছন্দ করেন না, যাই বল না কেন, সেখানেও না গেলেই ভালো।

এসব ছাড়াও দেখ্‌বে বহু যাবার জায়গা আছে। কাজেই এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই, তা' ছাড়া যা'দের সঙ্গে রোজ ক্লাশে দেখা হচ্ছে তাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া না করলেই বা ক্ষতি কী?

এই ধরণের কত কথাই যে হ'ত মণিমালার সঙ্গে তার আর লেখাযোখা নেই। গল্পের বই পড়া নিয়ে একবার একখানি গোটা মহাভারত রচনা হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যেবেলা দেখা গেল মণিমালা বারান্দার কোণায় বসে মহানন্দে শরৎবাবুর 'শ্রীকান্ত' পড়ছে। মেয়ের মতিগতি দেখে বাড়ির সকলের চক্ষুস্থির! এই বয়স থেকে যদি 'শ্রীকান্ত' ধরে, পরে এর কি অবস্থা হবে ভেবে সবাই আকুল, বকাঝকা, কান্নাকাটি। ব্যাপারখানি আমার কর্ণগোচর হ'তে বেশী দেরী লাগেনি, মণিমালাই চার পৃষ্ঠা লম্বা এক চিঠি লিখে নালিশ জানিয়েছিল, বইখানি যখন সাক্ষাৎ জ্যাঠামশাইএর আল্‌মারি থেকে বের ক'রে নেওয়া, এবং প'ড়ে যখন সে আনন্দ পাচ্ছে আর সবটা না বুঝ্‌লেও মোটামুটি মানেটানেও সব বুঝ্‌ছে তখন বই পড়াটা কিসের অন্যায় একথা কেউ তাকে বলে দিল না।

এই চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম ঃ

স্নেহের দিদিমণি

গল্পের বই পড়ে মানুষ মন্দ হয়ে যায় একথা আমি মানি না। আর ঠিক সেইজন্য তোমার বাবা কাকারা 'শ্রীকান্ত' পড়াতে আপত্তি করেছিলেন এও আমার মনে হয় না। আসল কথা হ'ল সব বয়সেরই যেমন উপযুক্ত খাওয়াদাওয়া, সাজসজ্জা, খেলাধূলো আছে, বই পড়ার বেলাতেও তাই। ও বইটা ঠিক চোদ্দ বছরের

মেয়েদের জন্য লেখা নয়, ঐ সময়টুকু বরং যদি শরৎবাবুরই পণ্ডিত-মশাই বা বামুনের মেয়ে বা দত্তা পড়তে কি বঙ্কিমবাবুর যে কোন বই, বা রবিবাবুর কোনও বই পড়তে, দেখ্‌তে তোমারও ভালো লাগ্‌ছে, আর অন্য কেউও আপত্তি করছে না।

তবে বই পড়ে মানুষ মন্দ হয় এ আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। মন্দ হয় না কিন্তু জ্যাঠা হয়ে যায়, ঝুনো নারকোলের মত পেকে ঝানু হয়ে যায়, কৈশোরের সুকুমারত্ব আর কিছু থাকে না। বড়রা কি করে না করে, কি ভুলচুক দোষত্রুটি ঘটায়, সেসব বিচার করবার জন্য ত' সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে, এখনই তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার ত' কোনও দরকার নেই। এখন তোমাদের নিজেদের বয়সের ভাবনাচিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও।

তবে বইটা পড়েছ ব'লে এমন কিছু অপরাধ কর নি, না হয় অকালে একটু জ্ঞান বাড়িয়েই ফেলেছ। যেমন দেহের শক্তি যতক্ষণ না অন্যায় কাজে লাগছে ততক্ষণ সে কদাচ মন্দ হ'তে পারে না, তেমনি জ্ঞানকেও যতক্ষণ না অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করছ ততক্ষণ সেও কদাচ মন্দ হ'তে পারে না।

তাই বলে যেন আবার ভেবে ব'স না যে বই মাত্রেই ভালো। এমন অনেক নোংরা বই আছে, যা তোমাদের কেন, তোমার জ্যেঠামশাইএরও পড়া উচিত নয়। সে বই পড়ে যদি কেউ আনন্দ পায় তা'হ'লে তা'র মনটা যে কুরুচিতে পূর্ণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকে আবার দেখ্‌বে এই ধরণের বই পড়েছে ব'লে বাহাদুরি নিতে চেষ্টা করে, আর যারা পড়ে না তা'রা নাকি সেকেলে, এই বলে নাক সিঁটকোয়। তাদের জিজ্ঞাসা করো হাতে পায় নোংরা কাদা লেগে গেলে তখুনি গিয়ে ধুয়ে ফেলে কেন? এই লোকরা যে সবাই মন্দ তাও নয়। মানুষের রুচির কথা আর

কী বল্‌ব দিদিমণি? তাজা মাছ ছেড়ে সুঁট্‌কি মাছ খায়, বলে হরিণের মাংস নাকি পচা ধরলে তবে খেতে ভালো হয়।

আমার নিজের মতটা জান্‌তে চেয়েছ, আমার মনে হয় ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা কী পড়বে না পড়বে, অভিভাবকদের দেখে দেওয়া উচিত। কারণ তুমি যাই বল না কেন দিদিমণি ছোটরা মুখ্যু হয়, বোকা হয়, যে যা বলে বিশ্বাস করে, কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা খারাপ বুঝ্‌তে পারে না, এক কথায় অতিশয় স্টুপিড্‌ হয়। তাদের ষোল বছর বয়স হ'তে হ'তে আশা করা যেতে পারে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি একটু ভালোমন্দ জ্ঞান, একটু সুন্দর অসুন্দর বোধও হবে। আমার মনে হয় তখন থেকে তাদের বই পড়া সম্বন্ধে একেবারে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া উচিত। যদি তারা মন্দ বই পড়ে, বুঝতে হবে এত শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও তাদের ঐ রকমই পছন্দ। এখানে মনে রেখো এ বিষয়ে সব সময়ে যে শুধু ভালোমন্দর প্রশ্ন ওঠে তা নয়, সুন্দর অসুন্দরের কথাও ওঠে। মানুষের ব্যবহারেও ত' দেখ্‌বে, কেউ বা সুন্দর ব্যবহার করছে, কেউ বা অশোভন আচরণ করছে। যে যেমন মানুষ।

এবার চিঠিখানি শেষ করতে হয় দিদিমণি, কারণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে যা'রা অতিশয় লম্বা লম্বা চিঠি লিখে থাকে, তাদের সব জেলে যাওয়া উচিত, তা' হ'লে দেশের লোক অনেক বেশী সুখী হবে।

তোমার সমবয়সী মেয়েদের যোগ্য অনেক ভালো ভালো পুরোনো ইংরিজি বই আছে, যেমন Little Women, Alice in Wonderland, সেসবগুলো পড়ে ফেলো কিন্তু।

অনেক ভালোবাসা নিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

চার

পুরোন বাক্স প্যাঁট্‌রাগুলো হাত্‌ড়ালেই রাশি রাশি মণিমালার লেখা চিঠিপত্র বেরিয়ে পড়ে। ভাবি বোধ হয় সব মেয়েদের জীবনেই যে সব ছোট বড় সমস্যা ওঠে, আমার মণিমালার জীবনেও তেমনি উঠেছিল। একখানি চিঠি পেলাম, চোদ্দ বছর বয়সে মণিমালা আমাকে লিখেছে। তার মধ্যে একথা সেকথার পর মণি লিখেছিল—ঠাকু'মা, তুমি এই সময় এখানে থাক্‌লে বেশ হ'ত। তুমি নিশ্চয় জান যে আমার মেসোমশাই ছু'বছরের জন্য বিলেত গেছেন আর মাসিমা সেইজন্য আমাদের বাড়িতে থাক্‌তে এসেছেন? মাসিমার মেয়ে সোনামানিকও এসেছে। সে আমার চেয়ে ছু'বছরের ছোট, আর কি সুন্দর দেখ্‌তে কি বল্‌ব ঠাকুমা। কি ফর্সা তার রং, কি রকম লম্বা লম্বা কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, আর চোখ নাক ঠিক পরীদের ছবির মত সুন্দর, প্রায় আমার সমান লম্বা, আর চমৎকার গান গায়, ছবি আঁকে। খুব ভালো, না ঠাকু'মা? কিন্তু আমার ওকে একটুও ভালো লাগে না। আমার ঘর ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি আজকাল মার ঘরের পাশের সেই বারান্দাতে থাকি। ও সেখানে এসে আমাকে বলে—তুমি বুঝি সাধারণ মেয়েদের মত ইস্কুলে পড় মণিদি? আমার মা বলেন ইস্কুলে যারা পড়ে তাদের উপরে উপরে বিদ্যে হয়, প্রকৃত জ্ঞান কিছুই হয় না। আমি তাই বাড়িতে মাষ্টার মশাইএর কাছে পড়ি। এখানেও বাড়িতেই পড়ব, তোমার বাবা আমার পড়া বুঝিয়ে দেবেন বলেছেন।

ঠাকু'মা তাই শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। আমি বলেছিলাম ঐ আনন্দেই থাক। বাবার মেলা কাজ, কখনই তোমার পড়া বোঝাবার সময় হবে না। তাইতে সোনামানিকের নাকি মনে কষ্ট হয়েছিল, সে কেঁদেকেটে মাসিমার কাছে নালিশ করেছিল, মাসিমা মাকে বলেছিলেন, আর মার কাছে আমি খুব বকুনি খেয়েছি।

আমি স্কুলে যাবার আগে যখন তাড়াতাড়ি করে স্নান সেরে, চুলটুল বাঁধি ও বসে বসে দেখে। আর বলে—"অত তাড়াতাড়ি কর বলেই ত' গা রগ্‌ড়ে স্নান করতে পার না, কিছু মেখেটেখেও স্নান করতে পার না, তাই ত' তোমার গায়ের রং ময়লা।" আমি রেগে বলি—"বেশ, আমার গায়ের রং ময়লা থাকুক্! তুমি খুব ফর্সা ত,' তা হলেই হ'ল!" ও আবার তাই নিয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদল। মাসিমা বল্লেন আমার মত ঝগড়াটি কেউ হয় না।

এই ধরনের কত কথাই যে মণি লিখ্‌ত। বাড়িতে অতিথি থাকাতে সব পুরোন নিয়ম পাল্‌টে গেছে, খাওয়া দাওয়া সুদ্ধ বদ্‌লে গেছে, বাবা মার সঙ্গ পাওয়া দায় হয়ে উঠেছে। এখন মণিমালা করে কী? এই সমস্যার কোনও মনের মত সমাধান করতে পারলাম না। মণিকে লিখলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

তোমার অবস্থাটা বেশ বুঝ্‌তে পারছি। তুমিও কিন্তু তোমার মাসিমা আর সোনামানিকের অবস্থাটা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র। তারা নেহাৎ বাধ্য হ'য়ে তোমাদের বাড়িতে এসে রয়েছে। তারা যখন তোমাদের অতিথি, তখন তাদের যা'তে কোনও কষ্ট না হয় সেটুকু তোমার সর্বদা দেখা উচিত। কাজেই ঘর ছেড়ে দেওয়া নিয়ে কোনও দুঃখ থাকা উচিত নয়। তারপর তাদের একরকম মতা-

মত, তোমাদের অন্য রকম, এই নিয়েও ত' ঝগড়া করা চলে না। ছুনিয়াতে যে কত রকমের মতের লোক বাস করে তার কোনও হিসাব নেই। মত না মিল্‌লেই মানুষ মন্দ হয়ে যায় না, তারা তাদের মত থাকুক্, তোমরা তোমাদের মত থেকো। সোনামানিক যখন নিজের মতটা প্রকাশ করে, তখন অমন রেগে না গিয়ে তুমিই বা কেন তোমার মতটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বল না? তার পর পাঁচজন অতিথি থাক্‌লে খাওয়া দাওয়াটা খানিকটা বদ্‌লে নিতে হয় বৈকি, কারণ যাতে সকলের সুবিধা হয় সেই ভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। তুমি কেন এই নিয়ে দুঃখ কর বল ত? তোমার বাবা মারা তোমারই আছেন, সত্যি যদি তোমার কোনও অসুবিধা থাকে, তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেই ব্যবস্থা হয়। অন্যের জন্য খানিকটা কষ্ট ভোগ করতে চেষ্টা করা ভাল নয় কি দিদিমণি? আমাদের জীবনটা এত বেশী নিজেদের নিয়ে কাটে যে স্বার্থপর হয়ে পড়বার বড় ভয় থাকে। তারপর আত্মীয় স্বজনের জন্য করবে না ত' কার জন্য করবে? যখন আমার মত বুড়ো হবে, দেখবে ঐ সব ছোট ছোট অসুবিধাগুলো কিছুই নয়, কিন্তু ওর মধ্য দিয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যে একটা ভালো-বাসার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সেটাই হ'ল আসল কথা। সোনামানিকের মতটা মেনে নিয়ো না; কিন্তু সর্বদা ভালো ব্যবহার কর। কাউকে খারাপ লাগছে মনে করলে ক্রমশঃ তাকে আরও বেশী খারাপ লাগতে থাকে; এমন কি কোনও অসুবিধাকেও বড্ড কষ্ট বলে যত মনে করবে, সামান্য অসুবিধাও তত অসহ্য বলে মনে হ'তে থাক্‌বে। তুমি নিজে ছাড়া আর কে তা'তে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বল? অতএব দিদিমণি, মুখ তোল, হাসি মুখ কর। ইতি।—

তোমার ঠাকু'মা।

এই সংসারে আত্মীয়স্বজনরা যত অশান্তি ও দুঃখের কারণ হয়, এমন আর কেউ হয় না, একথা মণিমালা অতি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করেছিল, এবং আমাদের ভালোবাসার উপর আত্মীয়-স্বজনের একটা বড় দাবী আছে ব'লে, নিতান্ত যে পর, প্রয়োজন হ'লে তাকে যেমন ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় এদের তেমন যায় না, এও মণি বুঝে নিয়েছিল। সেবার পূজোর আগে আমাকে লিখেছিল—

"শ্রীচরণেষু ঠাকু'মা, শেষ পর্যন্ত আমাদের পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া হ'ল না, আমার নতুন হল্‌দে জামাটা মিছি মিছি বোনা হল"। ব্যাপার হ'ল যে মণির দূর-সম্পর্কের পিস্তুত বোন বিধবা হ'য়ে তিন চারটি ছেলেপুলে নিয়ে মামা বাড়িতে আস্‌ছে, দু'দিন থেকে আবার একটু গোছ গাছ করে নেবে। মাঝখান থেকে মণিদের বেড়ানটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি মণিকে লিখ্‌লাম—

স্নেহের দিদিমণি,

তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে আমার কাছে চলে আস্‌তে পারতে। এখানে পাহাড় নেই বটে, কিন্তু আমার পুকুর ধারে শিউলী-গাছতলায় রোজ সকালে রাশি রাশি শিউলী ফুল পড়ে থাকে। আমাদের নন্দিনী গাইএর কি সুন্দর কালো বাছুর হয়েছে সে আর কি বল্‌ব, আর পেয়ারা গাছে ডাঁসা পেয়ারার ত' অন্তই নেই। ইচ্ছা হ'লে তুমি স্বচ্ছন্দে মলি ডলিকে আর

ওদের ভাই পানুকে নিয়ে চলে আস্তে পার। গুপেটাকেও এনো। আমি খুসিমনে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

তবে একটা কথা বলি দিদিমণি। তোমার চিঠি পড়ে মনে হ'ল দরকারের সময় আত্মীয় স্বজনরা ঘাড়ে পড়েন বলে তোমার যেন বিরক্ত লাগে। এই সেদিন মাসি আর মাস্তুত বোন কিছুদিন থেকে, যদি বা চলে গেল ত' আবার পিস্তুত দিদি আর তার ছেলে পুলে এসে আবার বাড়ি ওলট্ পালট্ করছে বলে যেন তুমি সেরকম সন্তুষ্ট নও। তুমি কি কখনও লক্ষ্য করেছ যে আমাদের দেশের জীবনযাত্রা এক দিকে আত্মীয় স্বজনকে নিয়েই সম্পন্ন হয়। বিলেতে দিব্যি "আণ্ট" "আঙ্কল্" বলে সেরে দেয়; আমাদের সম্বন্ধ গুলো আরো ঘনিষ্ঠ বলে আমরা কী রকম "আণ্ট", মাসি না পিসি, মামী না খুড়ী—কী রকম আঙ্কল্, বাবার ভাই না মায়ের ভাই, তার চেয়েও বেশী বাবার বড় ভাই না ছোট ভাই, জ্যাঠা না খুড়ো, এত সব সূক্ষ্ম ভেদ নিয়ে মাথা ঘামাই, তার কারণ এদের পাঁচজনাকে নিয়েই আমাদের জীবন। শুধু আমি, আমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে কি আর তোমার বুড়ো ঠাকু'মার জীবনটা কেটেছে দিদিমণি? আমার বিয়ের সময় আমার শাশুড়ী বলেছিলেন যে আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু একটি মাত্র মানুষকে বিয়ে করে না, তার গোটা পরিবারটাকেই বিয়ে ক'রে ফেলে। একথা সত্যি। এর অবশ্য দুটো দিকে আছে। আত্মীয়স্বজনরা যদি অন্যায় আব্দার করে তা' হ'লে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে দুঃখী নিরাশ্রয় তাকে কখনও ফিরিয়ে দিও না। যে নিরাশ্রয় সে যে ঠাকুর দেবতার সমান হয়ে যায়, দিদিমণি, তা'র জন্য যতটা তোমার সাধ্য থাকে করতে চেষ্টা ক'র। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

সাংসারিক জীবন যে কত জটিল মণির এক একটা চিঠি তার এক একটা নমুনা। শাসন করা নিয়ে সে কত রকমের সমস্যা। মণি লিখল বাবা মা কিছু বলেন না, জ্যেঠী কেন বল্‌বেন। আরো লিখল বড় বোন বলে তাকে ছোটদের জন্য অনেক সুখ সুবিধা ছেড়ে দিতে হয়, তাদের অনেক সেবা পরিচর্যাও করতে হয়, পড়া বলে দিতে হয়, দরকার হ'লে খাওয়া শোয়া দেখ্‌তে হয়, অথচ তারা দুষ্টুমি করলে যদি একটা চড় দিয়েছে কি না দিয়েছে, অমনি চ্যাঁ ভ্যাঁ, আর বড়দের নানান্ মন্তব্য। একটা বড় সমস্যা বটে। আমি লিখেছিলাম—

"স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে সিনেমা দেখ্‌তে গিয়েছিলে মা বাবার মত নিয়ে। তা'তে তোমার কোনও অপরাধ হয় নি, সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার জ্যেঠীমার কিছু বলাটা উচিত হয় নি। তোমার কর্তব্য প্রধানতঃ মা বাবার প্রতি, তবে কি না, এক বাড়িতে যখন আছে, অন্য গুরুজনরা যেটা ভালোবাসেন না, সম্ভব হ'লে সেটাও ক'র না। তবে তাঁদের মধ্যে মত ভেদ হ'লে মা বাবার কথাটাই রেখো। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও যেমন তাঁদের কথাটা রাখ্‌বে। বড় পরিবারের ঐত একটা মস্ত অসুবিধা দিদিমণি, পাঁচজনা পাঁচ রকম পরামর্শ দেন। সেদিক দিয়ে আলাদা আলাদা থাকাটা ভালো। তবে বড়রা যা বলেন সে সব মন দিয়ে শুনো তারপর যখন নিজে একটু বড় হ'বে বুদ্ধি শুদ্ধির একটা পরিণতি হ'বে, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে কাজ কর। তখন মা বলেছেন কি বাবা বলেছেন, বলে নিজের কাজের

দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা ক'র না। তখন তোমার মাবাবার প্রতি কর্তব্যের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াবে তোমার নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রতি তোমার কর্তব্য, একথা সর্বদা মনে রেখো। আমি এখন আর চাই না যে তোমার বাবা জ্যাঠা আমার কথা মত চল্‌বে। আমি চাই তারা তাদের নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাটাবে আর নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিজেরা বইবে।

ছোট ভাই বোনদের কথা যা লিখেছ সে ঠিকই বলেছ। আমার মনে আছে, আমি আট দশ জন ভাই বোনের মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম। তার মধ্যে আমি ছিলাম বড়র দিকে, কাজেই ছোটদের তদারক করার ভার খানিকটা আমার উপর পড়ত। আমি ওদের নাওয়া খাওয়া কাপড় ছাড়া ঘুমোন সব তত্ত্বাবধান করতাম, বানিয়ে বানিয়ে রাশি রাশি গল্প বল্‌তাম, দুষ্টামি করলে ঠাট্টা করতাম আর বেশী বাড়াবাড়ি করলে কষে পিট্‌তাম। তবে যা'কে ভালোবাসো না তাকে কখনই পিটো না। রাগের মাথায়ও কখনও কারো গায়ে হাত তুলো না। মার জিনিসটাই মন্দ, কারণ মার হ'ল বাহুবলের কাছে বুদ্ধির পরাজয়। ছোটদের যদি মারো, তুমি তা' হ'লে স্বীকার ক'রে নিচ্ছ যে তোমার বুদ্ধি দিয়ে ওদের শাসন করতে পারছ না বলে, বাহুবল দিয়ে দমন করছ। ওরাও সেটা বেশ বুঝতে পারে, আর তোমাকে কখনও শ্রদ্ধা করবে না। কাজেই মেরো না। নেহাৎ বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত। বক্‌বে বই কি, কিন্তু অভদ্র বা রূঢ় ভাষায় না বলে আসল জায়গায় খোঁচা দিয়ে ব'ল, কার কোথায় অন্যায় হয়েছে। তাছাড়া কখনও পার্সে-লিটি করবে না, বয়সের জন্য শাসনের কমবেশী চল্‌তে পারে, আর কোনও কারণে নয়। বড়রা কেন ছোটদের বক্‌লে টক্‌লে, অত আপত্তি করেন জান ত? প্রথমতঃ তোমাদের শাসনের মাত্রা হয়ত

ঠিক থাকে না। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যশাসনের নেশাটা এত মিষ্টি যে নিজের কর্তৃত্ব ফলাবার জন্যও ছোটদের শাসন করবার লোভ হ'তে পারে। তৃতীয়তঃ যেমন ছোটদের মানুষ করার ভার সম্পূর্ণ তোমার হাতে নেই তুমি বড়দের নির্দেশ পালন করছ মাত্র, তেমনি তাদের শাসন করার সব ভারও তোমার মত ছেলে-মানুষের হাতে ত আর থাকতে পারে না দিদিমণি, তেমন তেমন হলে বড়দের হাতেই শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো না কি? আমি কিন্তু আজকাল আর তোমার দাদুকে ছাড়া কাউকে শাসন টাসন করি না। হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, আমাদের 'জকি' বলে একটা কুকুরবাচ্চা এসেছে, সেটাকেও আমি দিনরাত তাড়া করে বেড়াই, আর খুব ভালোবাসি বলে বেদম শাসন করি। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

এই সব চিঠিপত্র লেখার পর কতকাল যে কেটে গেছে কিন্তু পারিবারিক সমস্যাগুলোর এখনও নিষ্পত্তি হয় নি। সেবারই পূজোর আগে মণিমালাকে আরেকখানি চিঠি লিখেছিলাম—

স্নেহের দিদিমণি—

মলি, ডলি, পানু, গুপী আর তুমি আস্‌ছ বলে কত যে আনন্দ হচ্ছে বল্‌তে পারি না। এই তিনটে সপ্তাহ তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে মলি-ডলিদেরও আংশিক স্বাধীনতা হ'ল।

তোমরা মিলেমিশে পরস্পরের শাসনটাসন চালাবে। তুমি সব চেয়ে বড় তোমাকে ক্যাপ্টেন করা হ'ল, কিন্তু ওদেরও ভোট্ নিতে হবে। ঐ যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম গুপীটা ত তোমার চেয়ে বড়, আচ্ছা ওকেও তোমার সমান অধিকার দিলাম। কিন্তু নিজেদের কাজকর্ম পড়াশুনো সব নিজেরা চালাবে— ইতি।

ঠাকু'মা।

বলা বাহুল্য সে ছুটিটা নির্বিঘ্নে কেটেছিল।

বয়স ত' আর কারো জন্য বসে থাকে না, আমার সেই বারো বছরের বোকা মণিমালারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে একদিন পনেরো বছর পূর্ণ হ'য়ে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে বস্‌ল। যেই না তার স্কুলের পড়া শেষ হ'ল সঙ্গে সঙ্গে যেন তার কৈশোরের খাতার পাতাও ফুরিয়ে গেল। আমার নাত্‌নী মণিমালা খেলা-ধূলো ছেড়ে সত্যিকারের ভাবনাচিন্তা নিয়ে পড়ল। এই সময় আমি তাকে লিখ্‌লাম—

স্নেহের মণিমালা,

আমার সেই ছোট্ট নাত্‌নী মণিমালা যে আজ সত্যি সত্যি স্কুলের পড়া শেষ ক'রে ম্যাট্রিকুলেশন-এর গণ্ডি পার হয়ে গেল এ যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। তুমি পাশ করেছ ব'লে আমার কত যে আনন্দ হচ্ছে ভাষায় তা'কে প্রকাশ করতে

পারছি না, আবার এতদিনে সত্যি তোমার ভাবনা-চিন্তাবিহীন সুখের শৈশব শেষ হ'য়ে গেল, এইজন্য বুড়ো ঠাকু'মার একটু দুঃখও হচ্ছে।

যেমন বড় হ'তে থাক্‌বে, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দেখ্‌বে রাশি রাশি নতুন কর্তব্য, নতুন দায়িত্ব, নতুন অভিজ্ঞতা। অথচ তোমার ভিতরের মানুষটির হঠাৎ কোনও একটা আমূল পরিবর্তন হবে না। সহসা এমন কোনও নতুন জ্ঞান কি শক্তি লাভ করবে না যা দিয়ে এই নতুন সমস্যাগুলোর একটা সহজ নিষ্পত্তি ক'রে ফেল্‌তে পারো। কিন্তু তা বল্‌লে হবে কেন, লোকের চোখে তুমি ছিলে স্কুলের মেয়ে, হয়ে গেলে কলেজের ছাত্রী, যেমন তোমার মান-সম্ভ্রম বাড়ল, সেই সঙ্গে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও যে অনেকটা বেড়ে গেছে এ বিষয়ে আর কারো মনে কোনও সন্দেহ রইল না। কিন্তু তুমি জান যে চার মাস আগেও তুমি যা' ছিলে, এখনও তুমি প্রায় তাই আছ, শুধু কর্তব্যভার একটু গুরু হয়েছে, এইমাত্র।

এই সব কারণেই বাড়ির লোকরা কথায় কথায় তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আর তুমি স্কুলে-পড়া ছোট মেয়েটি নও, অথচ তুমি নিজের মধ্যে কোনও পরিবর্তন টের পাচ্ছ না।

আমাকে লিখেছ এখন তোমাকে কী করতে হ'বে। আমার মনে হয় প্রথমেই তোমাকে খানিকটা গাম্ভীর্য ধারণ করতে হ'বে। এই গাম্ভীর্যটা আসলে তোমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তবে এতদিন স্কুলের মেয়ের শিশু-সুলভ আচরণ করতে ব'লে সেটা খুব প্রকাশ পাচ্ছিল না, এখন সকলেই তাকে পরিদৃশ্যমান দেখ্‌তে চান। তোমার পোশাকে পরিচ্ছদে চলনে বলনে এবার একটু গাম্ভীর্য, ইংরিজিতে যা'কে ডিগ্‌নিটি বলে, সেই জিনিসটি একটু প্রকাশ কর দিকিনি।

আমার মনে আছে আমাদের সময় নিয়ম ছিল কলেজের মেয়েরা খোঁপা বেঁধে কলেজে আস্‌বে, আর স্কুলের মেয়েরা বেণী ঝুলিয়ে স্কুলে যাবে। সে এক ব্যাপার, দিদিমণি। আমরা আধ-ঘণ্টাখানেক ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কত না কষ্ট ক'রে গোটা পনেরো কুড়ি লোহার কাঁটা আর গজখানেক কালো ফিতের সাহায্যে, ইয়া বড় বড় ফোঁপরা ফাঁপা খোঁপা বেঁধে কলেজে যেতাম। আমার সত্যি মনে হয় ঐ খোঁপা বাঁধার কষ্টটা রোজ স্বীকার করবার পর আপনা থেকেই কেমন একটা গাম্ভীর্য আমাদের এসে যেত। তোমাদের ত' সেরকম কোনও বালাই নেই, তোমাদের স্কুলের আর কলেজের পোশাকে কোনই প্রভেদ দেখ্‌তে পাই না, কাজেই শুধু আচরণ দিয়ে তোমাদের প্রমাণ ক'রে দিতে হ'বে যে তোমরা এবার বড় হয়েছ।

তা' হ'লে পথে ঘাটে অত হাস্‌তে পাবে না, কখনও অত জোরে কথা বল্‌তে পাবে না, নিম্ন স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বল্‌লে দেখ্‌বে শুন্‌তে কত মিষ্টি লাগ্‌ছে।

তারপর কাজকর্মের দায়িত্ব নেবারও এবার তোমাদের বয়স এবং শিক্ষা হয়েছে। এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে, নিজের অংশটুকু কোনও রকমে সেরে দিয়ে আর দায়মুক্ত হওয়া চল্‌বে না। হঠাৎ যে সব কর্তব্যের গুরুভার নেবার ক্ষমতা তোমাদের হয়েছে এ কথা কি আর সত্যি কেউ মনে করে? তবে ম্যাট্রিক যখন পাশ করেছ তখন তোমার বিদ্যেবুদ্ধির একটা যেন মাপ পাওয়া গেল। কাজেই তার অনুযায়ী ব্যবহার সকলেই আশা করে। সেটা কি খুব অন্যায়, বল ত' মণি?

দায়িত্বের কথা বল্‌তে মনে হ'ল যে দুদিন বাদে তোমার কলেজ খুল্‌বে, কোন্ কোন্ বিষয় পড়বে স্থির করেছ কি? দেখিয়ে

দাও ত' কত তোমার দায়িত্বজ্ঞান। এলোমেলোভাবে যেটা সহজ মনে হবে সেইটা নিয়ে ব'সো না, তারপরে সেটা তোমার কোনও কাজে লাগ্‌বে কি না সেটা বিবেচনা ক'রো। আমি যে কত কষ্ট ক'রে কলেজে চার বছর ধরে অঙ্ক শিখেছিলাম সে আর কী বল্‌ব দিদিমণি, কিন্তু তারপর সে উঁচুদরের বিদ্যাটিকে আর কোনও কাজে লাগালাম না, এখন দুঃখ হয়। তুমি যেন এরকম দুঃখের সুযোগ রেখো না, মণি। উদ্দেশ্যহীন কাজ ক'রো না। ইতি

—তোমার ঠাকু'মা।

তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কলেজপড়া সুরু হ'য়ে গেল, মণিমালার জন্য মেলা নতুন নতুন মোটা মোটা বই কেনা হ'ল, আমি একটা ছোট হাতঘড়ি কিনে পাঠিয়ে দিলাম, আর সেই সঙ্গে এই চিঠিটাও লিখ্‌লাম।

স্নেহের দিদিমণি,

শুনেছি রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইংরিজি শব্দ "পাঙ্ক্‌চুয়েলিটির" বাংলা হয় কি না। তিনি হেসে বলেছিলেন যে আমাদের মধ্যে ও গুণটার কিঞ্চিৎ অভাব থাকাতে টপ্‌ ক'রে একটা চলিত বাংলা শব্দ মনে পড়ে না, কিন্তু "সময়-নিষ্ঠা" কথাটা কেমন হয়? সেই থেকে ঘড়ি দেখ্‌লেই আমার "সময়-নিষ্ঠা"র কথা মনে পড়ে। আর সেই জন্য তোমাকে হাতঘড়িখানি পাঠালাম এই ইচ্ছা ক'রে যে তুমি যেন সময়-নিষ্ঠ হও, যেন

তোমার জীবনে এমন দিন কখনও না আসে যখন ব্যর্থ-সময়ের জন্য তোমার অনুতাপ হবে। সময় যে কত মূল্যবান জিনিস সেটা শিখবার এই তোমার সময়।

তোমাকে কি পরামর্শ দিই বল ত'? তুমি লিখেছ মেয়েদের হোষ্টেলে থেকে, ছেলেদের কলেজে ভর্তি হয়েছ। তোমাদের ক্লাশের চার ভাগের একভাগ মেয়ে, শুনে অবাক্ লাগ্‌ছে। আমাদের সময় ছেলেদের কলেজে মেয়েদের বড় একটা নিত না, তবে এম্-এ ক্লাশে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ত, এই ধর জনা আশী নব্বুই ছেলের সঙ্গে তিনজন মেয়ে পড়ত। মাষ্টার মশাইদের পাশে তাদের জন্য আলাদা একটা বেঞ্চি দেওয়া হ'ত, আর তারা মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশে ঢুকত, আবার তাঁরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে যেত, আবার পরের ক্লাশের মাষ্টার মশাইএর সঙ্গে আস্‌ত। তখনও মেয়েরা দেবীর আসনটা ছেড়ে দেবে কি না মন ঠিক করতে পারে নি ব'লে সকলের বোধ হয় ভয় হ'ত যে সহপাঠীরা যদি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে না পারে।

তোমাদের বেলাতে দেখ্‌ছি সে সব চিন্তা কারো হয় না, তোমরা এমনিতেই দলে এতটা ভারী আছ যে অশ্রদ্ধা করবার সাহসই হবে না কারো। তাছাড়া সত্যি কথা বল্‌তে কি, আজকাল পথে-ঘাটে, ট্র্যামে-বাসে, হাট-বাজারে, মেয়েরা ও তাদের মায়েরা এমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পান যে ছেলেদের কলেজে মেয়েরা পড়বে এর মধ্যে হৈ-চৈ করবার কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রকমই হওয়া উচিত।

তবে কি জান, কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি ভালো নয়। বুদ্ধদেব তাঁর গৃহী শিষ্যদের একটা বড় ভালো কথা বল্‌তেন সুবর্ণ-মন্ন মধ্য-পথে চল্‌বার কথা। ছেলেদের সঙ্গে পড় খুব ভালো কথা, এমন

কি দল বেঁধে ক্লাশশুদ্ধ সকলে যদি কোথাও বেড়াতেও যাও তা'তেই বা কী? তোমরা হ'লে দেশের ভবিষ্যৎ, একসঙ্গে পড়া-শুনো, কাজকর্ম, খেলাধূলো করবে বৈ-কি। কিন্তু কোনও রকমের বাড়াবাড়ি নয়। সুবর্ণ-ময় মধ্যপথে রোমাঞ্চ কিঞ্চিৎ কম থাক্‌তে পারে, কিন্তু বড় নিরাপদ, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পক্ষে আদর্শ পথ।

তাছাড়া গতবার যে ডিগ্‌নিটির কথা বলেছিলাম সেটাও কিন্তু ভুলো না। নিজেদের সম্মান নিজেদের রক্ষা করে চল্‌তে হয়। ট্র্যামে বাসে লেডিজ্‌ সীট খালি না থাক্‌লে, যদি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, আশা করি তোমরা পুরুষ মানুষদের অভদ্র আখ্যা দাও না?

পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়ে যখন সমান সমান অধিকার দাবী কর, তখন তোমাদের সমান সমান দায়িত্ব নেবার জন্যও প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। ট্র্যামে বাসে জায়গা কম থাক্‌লে কারা বস্‌বে জান? যারা বুড়ো, অথর্ব, অসুস্থ, তারা। যাই বল, মেয়েদের শরীর বেশী দুর্বল এটা বাজে কথা। আমার মনে হয় মেয়েদের মাস্‌ল্‌-এ কম জোর থাক্‌তে পারে, ভারী বোঝা হয় ত' তুলতে পারে না, কিন্তু সহ্য করবার বা কাজ করবার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং বেশীই। কাজেই কেন তারা দাঁড়াবে না? যদি সত্যি সত্যি পুরুষদের সঙ্গে সমান হ'তে চাও, তা' হ'লে কোনও বিষয়ে পক্ষ-পাতিত্ব দাবী করতে পারবে না। আমার মতে লেডিজ্‌ সীটগুলো একেবারে তুলে দেওয়া উচিত। বুড়োরা, দুর্বলরা, অসুস্থরা বস্‌বে, আর সবাই দরকার হ'লেই দাঁড়াবে। যদি এটাকে জীবনযাত্রার একটা নিয়ম করে নাও, দেখ্‌বে অনেক সমস্যাকেই আর সমস্যা ব'লে মনে হ'বে না। তবে কদাচ বাড়াবাড়ি নয়। তোমার মতামত নিশ্চয় জানিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

আরেকখানি চিঠি লিখেছিলাম—

স্নেহের মণি,

তুমি লিখেছ যে ছেলেমেয়েরা ক্লাশশুদ্ধ দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়াতে যখন কোনও দোষ নেই, তখন দুচার জনাতে ছোট দল ক'রে যেতেই বা কি দোষ আছে? আরো লিখেছ, বাড়ির লোকেরা তাদের সঙ্গে সিনেমা দেখ্‌তে যাওয়াতে যখন আপত্তি করেছেন তখন একসঙ্গে পড়ানোতেও আপত্তি থাকা উচিত ছিল। এ কিন্তু তোমার ছেলেমানুষী কথা হ'ল দিদিমণি। মোটেই তোমাদের অবিশ্বাস করা হয় ব'লে বারণ করা হয় না। এর মধ্যে অবিশ্বাস করার কথাই ওঠে না, যা'তে কোনও রকম বিপদ বা নিন্দার কারণ না ঘটে, সেই জন্য সাবধান হওয়া, এইটুকু মাত্র।

তোমরা ছেলেমানুষের দল যে আমাদের পুরোন নিয়মগুলোই আঁক্‌ড়ে থাক্‌বে এ আমরা চাই না। পুরোন বলেই যে একটা নিয়ম ভালো হয়ে যায় এ কথা আমরা মোটেই বলি না; তা' হ'লে পৃথিবীর ত' কোনও দিকেই কোনও উন্নতির পথ খোলা থাক্‌ত না। তবে কয়েকটা গুণ আছে, নিয়ম আছে, যারা কখনও পুরোনও হয় না, যাদের মূল্যও কখনও কমে যায় না, কারণ তারা চিরন্তন। তুমি কি বল্‌তে চাও সুনাম জিনিসটা কিছুই নয়? এ কথা সত্যি যে নিজের ধর্মবোধের কাছে লোকের মতামতের কোনও মূল্য নেই। বড় জিনিসের জন্য সর্বদা ছোট জিনিসকে ত্যাগ করতে হয়। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, প্রয়োজন হ'লে সুনামকেও ত্যাগ করতে হ'তে পারে। কিন্তু যতদিন না ঐ রকম সাংঘাতিক একটা পরিবেশ রচনা হচ্ছে, ততদিন কি নিজের সুনামটাকে রক্ষা করবে না? তুমি লিখেছ যে নিজের মনে

জান্‌লেই হ'ল যে তুমি কোনও দোষ কর নি, লোকে কী বলে না বলে তা'তে কি-বা এসে যায়। লোকে যদি মিথ্যা ক'রে অন্যায় কথা বলে সত্যিই তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাই বলে তুমিও ইচ্ছা ক'রে এমন আচরণ ক'রো না যা'তে লোকের ভুল বুঝবার আশঙ্কা থাকে। যাই বল না কেন, সমাজে যদি বাস করতে হয়, তখন কতকগুলি সামাজিক আইনকানুনও সাধারণতঃ মেনে চল্‌তে হয়। প্রয়োজন হ'লে অবশ্য সেগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌তেও হয়! কিন্তু তাই ব'লে সামান্য একটু ফুর্তি করবার জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিলেতের আমেরিকার নজির দেখিও না, দিদিমণি। কারণ যতদিন না পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি অবস্থার তাদের সঙ্গে একটা মিল থাকছে ততদিন ওরকম তুলনার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া ওরা করছে ব'লেই জিনিসটা যে ভালো এ কথা আমি আদৌ মানি না। ওদের দেশে ওরা নিজেদের মতে নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনা করুক, আমরাও যেন ওদের নকল না ক'রে, নিজেদের ন্যায়বোধ অনুসারে নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনা করি।

পারবে সব বিষয়ে ওদের মত হ'তে? ওরা নিকৃষ্টতম গৃহকর্ম নিজের হাতে করে, মেয়েরা লেখাপড়া শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে বাপের উপর নির্ভর ক'রে থাকে না। এমন আরও কত কী। নকল করতে হয়, এই ভালো জিনিসগুলির নকল ক'রো, মণি।

মেলা বক্তৃতা দিয়ে ফেল্লাম এ ক'টা চিঠিতে, এর পরেরটাতে কিঞ্চিৎ আমাদের কথা বলা যাবে, কি বল? ভালোবাসা নিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

ছয়

ষোল বছর বয়সে আমার নাত্‌নী মণিমালা দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠ্‌ল। গরমের সময়ে কলেজ বন্ধ হ'লে, সেবার ওরা মামা-বাড়ি গেল। সেখান থেকে চিঠি পেলাম মণিমালার নানান্‌ ভাবনাচিন্তা, দিদিমারা সেকেলে মানুষ, নাত্‌নীর কবে বিয়ে হ'বে, নাত্‌জামাই নিয়ে রগড় করবেন সেই আশাতেই আছেন। তাঁদের কথা শুনে মণিমালার গাত্রদাহ হয়, আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে। উত্তরে আমি লিখি:

স্নেহের দিদিমণি,

যদিও বিয়ে করাটাই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে আমি মনে করি না, তবুও ব্যাপারটাকে তুমি যতটা মন্দ বল্‌ছ আসলে ততটা নয়। বিয়ে টিয়ে করেও ত' আমরা পাঁচজনা বেশ আছি, কাজকর্ম করি, আমোদ-আহ্লাদও করি। তোমাদের প্রোফেসার দিদিমণিদের জীবন আমাদের চেয়ে ভালো একথা শুধু তোমার দিদিমা কেন আমিও মানি না। আসল সমস্যাটা নয় বিয়ে করবে কি করবে না, সমস্যা হ'ল কবে বিয়ে করবে তাই নিয়ে।

তুমি রেগেই যাও আর যাই কর, বিয়ে করাটাই হ'ল স্বাভাবিক।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন লোকে বল্‌ত যে মেয়েদের

কলেজে পড়ালে তারা বিধবা হয়, নিদেন তাদের স্বভাবচরিত্র ভালো থাকে না। যে দেশে হাজার হাজার মুখ্যু বালবিধবা, সেদেশের লোকেরা এমন কথা বল্লে তার কি কোনও মূল্য থাকে? তোমার মামাবাড়িতে যাঁরা বলেন যে বেশী লেখাপড়া শিখ্‌লে মেয়েরা ভালো স্ত্রী হয় না, তাঁরা বোধ হয় এই মনে করে ওকথা বলেন যে লেখাপড়া শেখালে মেয়েদের নিজেদের মতামত গড়ে ওঠে, আর তারা স্বামীরা যা' বলে, ভালোই হোক্‌ আর মন্দই হোক্‌, চুপ ক'রে মেনে নিতে চায় না। ফলে সংসারে অশান্তি হয়। তবে অন্যায় সহ্য ক'রে, যে শান্তি স্থাপন করতে হয় সে শান্তির কোনও মূল্য আছে কি না, একথা বোধ হয় তাঁরা ভেবে দেখেন না।

মোট কথা, আমারও ইচ্ছা করে আমার নাত্‌নীর একটা ভালো বিয়ে হোক্‌, সে সুখে সংসার করুক্‌, আমিও নাত্‌জামাই দেখ্‌ব ব'লে মনে মনে আশা ক'রে আছি। তবে এখন নয়, আরও দু'চার বছর বাদে, আমার নাত্‌নীর শিক্ষাটা আরেকটু সম্পূর্ণ হ'লে তবে। আবার চিঠি লিখো। ইতি

তোমার ঠাকু'মা।

আরেকখানি চিঠি লিখেছিলাম এই সময়ে।

স্নেহের মণিমালা,

তোমার মামাবাড়িতে ঠাকুর-দেবতাদের খুব প্রতিপত্তি সে ত' ভালো কথা। তবে কি জান আমরা যেমন সব জিনিস নিয়েই করি, ঐ ঠাকুর-দেবতা নিয়েও বড্ড বাড়াবাড়ি করি। মুখে বলি

যে শুধু সংসারে জড়িয়ে থাক্‌তে ভালোবাসি না, একটু সংসারের বাইরেও মনটা যেতে চায়, ইত্যাদি, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার কাছে কী প্রার্থনা করি ? না, আমার অভাব দূর করে দাও, আমার ছেলেকে সুমতি দাও, মেয়ের ভালো পাত্র জুটিয়ে দাও, স্বাস্থ্য দাও, দীর্ঘ-জীবন দাও, মনের শান্তি দাও,—অর্থাৎ সাংসারিক সুখের সব ব্যবস্থা করে দাও। কাজেই দেখ্‌তেই পাচ্ছ ঐ ঠাকুরপূজোটুজো-গুলোকে, বেশীর ভাগ সময়েই আমরা নিজেদের সংসার গুছিয়ে নেবার উপায় বলে মনে করি। ধর্ম ভালো, কিন্তু ধর্মকে সংসারের সেবায় লাগিয়ে দিলে, ধর্মের আর কী বাকী থাকে ? তোমার দিদিমা আমাদের ধর্মহীন জীবনের প্রতি কটাক্ষ ক'রে ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা বলেন লিখেছ, তা'তে কি বা এসে যায় ? তুমি যদি মনে মনে বুঝে থাক যে ধর্ম মানে নয় ভগবানের কাছ থেকে নিজের সুখসুবিধা আদায় করতে চেষ্টা করা ; ধর্ম মানে জীবে দয়া আর ভগবানে বিশ্বাস, তা' হ'লেই হ'ল।

তোমার দিদিমারা যদি বলেন যে লেখাপড়া শিখেই তোমার এমন দুর্মতি হয়েছে, তবে আর কী করা যায় বল ? এটুকু অবধি বল্‌তে পার, যে জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌লেই যে ধর্মবিশ্বাস পালিয়ে যায় তার পালানোই উচিত। তোমাকে ত' ছোটবেলা থেকে বলেছি জ্ঞান কখনও মন্দ হয় না, তার অপপ্রয়োগটা অন্যায় হ'তে পারে, কিন্তু জ্ঞান সর্বদা সূর্যের আলোর মত পবিত্র। তাই দিয়ে ভগবানে বিশ্বাস চ'লে যাবে কেন ? যীশু খৃষ্ট একবার বলেছিলেন, যে কেবল মুখে 'হা ভগবান, হা ভগবান' করে সে প্রকৃত ভক্ত নয়। সেই হ'ল প্রকৃত ভক্ত যে ভগবানের ইচ্ছা পালন করে। আর বুদ্ধদেব ত' ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা করতেই অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, 'যাহা অপ্রকাশিত রহিয়াছে তাহা উহ্য থাকুক্।' ধর্মকে

বাইরের একটা ঢংএ পরিণত করলেই যত মুস্কিল। ফুল বেলপাতা দিয়ে আর কতখানি হবে বল, মনের ভিতরে যদি গলদ্ থাকে? তুমি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করো, সত্য আচরণ করো, সব প্রাণীকে দয়া করো, আর কিছুর দরকার হবে না। আর জ্ঞান তোমার প্রতি-বন্ধক নয়, তোমার সব চেয়ে বড় সহায়। তোমার মামাবাড়ির পাশেই তোমার বাবার পিসিমার বাড়ি লিখেছ, আশা করি সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করেছ? তোমার বাবার যে বুড়ী বড় পিসিমা আছেন, তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রো, আনন্দ পাবে। এর পরের চিঠিতে তাঁর বিয়ের গল্প বল্‌ব, সে এক মজার কাহিনী। লেখাপড়া শেখা ভালো না বিয়ে করা ভালো, তার একটা উত্তর পাওয়া যাবে। মিষ্টি আমলকীর চারাটারা পাও ত' এনে তোমাদের বাগানে লাগিয়ে দিও। সকলকে আমার ভালোবাসা দিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

তারপর মণিমালার বাবার বড় পিসিমার বিয়ের গল্পও লিখে-ছিলাম, মণিমালা ত' সে চিঠি পড়ে মহাখুসি।

স্নেহের মণি,

দেখলে ত' তোমার বাবার বড় পিসিমা ও পিসেমশাই কি চমৎকার লোক? এখন বল ত' বিয়ে করা লোকেরা কি সবাই মন্দ? চল্লিশ বছর আগে যদি বড় পিসিমাকে দেখতে, তোমার তাক্ লেগে যেত। বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে বেরিয়ে-ছেন, কুড়ি বছর বয়স, সাধারণ লোকে কবে তাঁর বিয়ের আশা

ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর বাবা-মা মনে মনে বিলেতফেরৎ জামাইএর স্বপ্ন দেখেন।

এদিকে বড় পিসিমাকে বিয়ের কথা বল্লেই রেগে ওঠেন। বলেন এদেশে বিয়ে হ'ল দাসীগিরি, তাও বিনি মাইনেতে। এদেশের লোকরা মেয়েদের শ্রদ্ধা করে না; এমন কত কী। তিনি এম্-এর জন্য প্রস্তুত হ'তে থাক্‌লেন, বেথুন কলেজেই প্রফেসারি করবেন।

দেখ্‌তে দিব্যি খাসা, লম্বা দোহারা গড়ন, গায়ের রংটিও খুব ফর্সা না হ'লেও দিব্যি ফুট্‌ফুটে, আর মাথায় এক ঢাল কালো কোঁক্‌ড়া চুল, দেখে আর কেউ বল্‌বে না যে লেখাপড়া করলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

সবই ভালো, খালি ঐ বিয়ের কথা বল্লেই মুস্কিল। বলতেন বিয়ে করলে নাকি মানুষ স্বার্থপর হয়ে যায়, কেবল আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার সংসার করে। দেশের কোনও কাজ করে না। তাঁর মা এদিকে বিয়ের গয়না গড়িয়ে রেখেছেন, দু একখানা করে বেনারসি কিন্‌ছেন, তাঁর এ ধরণের কথা ভালো লাগ্‌বে কেন। তিনিও রেগে বল্‌তেন "রেখে দে তোদের দেশের কাজ! তোদের হেমনলিনীদিদি কত দেশের কাজ করেন জানা আছে! আমরা তবু আমার ছেলে আমার মেয়ে করি আর ওঁরা ত' শুধু আমি আমি করেই গেলেন!"

নানান্ জায়গা থেকে বিলেতফেরৎ সব পাত্রদের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌ত, আমার শ্বশুর শাশুড়ী মহাখুসি হয়ে উঠতেন, এবার যদি মেয়ের মত হয়! কিন্তু কিসের মত, মেয়ে ঘরে দরজা এঁটে তখন শেক্সপীয়ার পড়ছে! কিন্তু ভবিতব্যে যা আছে বড় পিসিমা বি-এই পাশ করুন আর এম্-এই পাশ করুন, সে খণ্ডানো তাঁর সাধ্য ছিল না। একজন অতিশয় সুদর্শন, কেম্ব্রিজের ডিগ্রীওয়ালা

বক্তা এসে বেথুন কলেজে কী একটা উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। কৃতী ছাত্রী বলে বড় পিসিমাকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেওয়া হ'ল। বড় পিসিমা ত' গম্ভীর মুখ করে বাড়ি এলেন। বাড়ি এসে তাঁর মা বল্লেন "বেশ ছেলেটি, না রে? জামাই করবার মত বটে! তুই যখন বিয়ে থা' করবি না, ভেবে দেখলাম তোকে বিরক্ত করাটা ঠিক নয়। তোর পিসতুত বোন রমুর সঙ্গে হ'লে কেমন হয়?" বড় পিসিমা দুচোখ কপালে তুলে বল্লেন "কী যে বল মা, রমুটা একটা আকাট মুখ্যু, ওঁর সঙ্গে মানাবে কেন?" "তবে তোর খুড়তুত বোন বিনুর সঙ্গে?" "আঃ কি তোমার পছন্দ! বিনুটা যেমন কুঁড়ে সেই রকম বদ্‌মেজাজী!" "আচ্ছা, তোর মাসতুত বোন পুঁটি?" "হ্যাঁ, উনি পুঁটিকে বিয়ে করুন আর গুষ্টিশুদ্ধ সব ওঁর ঘাড়ে চাপুক্, বেচারী সবে চাক্‌রীতে ঢুকেছেন!" "তা' হ'লে তোর বন্ধুরাও ত' আছে, বি-এ পাশ করা সব ভালো ভালো মেয়ে, যাদের বিয়েতে আপত্তি নেই, ঘরকন্নার কাজও জানে, এই মলি, ডলি, লটি?" তখন বড় পিসিমা কেঁদেকেটে একাকার, "চেষ্টা করলে আমিও কি ঘরকন্না পারব না?" কাজেই দিদিমণি দেখতেই ত' পাচ্ছ যে বিয়ে করব না লেখাপড়া করব ওসবের কোন মানেই হয় না। বরং বল আপাততঃ ভালো করে পড়াশুনা করি, সেলাই-ফোঁড়াই রাঁধাবাড়াও শিখে রাখি, পরে সময়মত বিয়ের কথা ভাবা যাবে। আর বিয়ে যদি না-ও হয় তা'তেই বা কী এসে যায়, হাত-পা ঝাড়া হয়ে কাজকর্ম করা যাবে। এ দুনিয়াতে বোকারাই বলে আমি কক্ষণও এটা করব না ওটা করব না। বুদ্ধিমতীরা চুপ ক'রে থাকে, এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। বড় পিসিমার মত। ইতি।

ঠাকু'মা।

কলেজে পড়তে পড়তে আরও কত রকমের সমস্যা উঠ্‌ত মণিমালার জীবনে। সেবারে কী একটা জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মেয়েরা লম্বা এক প্রোসেসন্ করল। মণিমালাও ঝাণ্ডা নিয়ে বেরোবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় ওদের বাড়ি থেকে বারণ করে পাঠাল। মণিমালার প্রোসেসন্ করা হ'ল না, রাগ ক'রে খেল দেল না, কান্নাকাটিও কিঞ্চিৎ করে থাক্‌বে। আমি তাকে লিখলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

প্রোসেসন্ করতে দিল না বলে এত দুঃখের কী কারণ হ'ল ভেবে পেলাম না। তুমি যাও নি বলে কি দেশের কোনও একটা ক্ষতি হয়েছে? দেশের যাঁরা বড় বড় সেবক, তাঁরা কি সবাই প্রোসেসন্ করতেন? শোভাযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য লোককে জানানো আমাদের মনের ভাবটা। সে শোভাযাত্রা না করেও হয়। আর তুমি যদি তোমার জীবনের কাজ দিয়েই দেশপ্রেম প্রকাশ করতে না পারলে তবে আর শোভাযাত্রা করে কী হ'বে? যদি দেশের সেবা করতে চাও কেউ তোমাকে বাধা দেবে না আর যদি লোকদেখানো হুজুগে নাম্‌তে চাও বাড়ির লোকরা আপত্তি করবেই। সেবার যখন তোমাদের কলেজ থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয়েছিল, তখনও তাঁরা আপত্তি করেছিলেন মনে নেই? এগুলি হ'ল ব্যক্তিগত মতামতের কথা। তবে হুজুগে পড়ে কোনও কাজ না করাই ভালো, ওতে একটা অগভীর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। আমাদের সময় হুজুগে পড়ে কত ছেলেমেয়ে যে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে, পরে অনুতাপ করেছে তার লেখাযোখা নেই। তুমি

লিখেছ তবে কি ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতে যোগ দেবে না? প্রয়োজন হ'লে দেবে বৈ কি। কিন্তু তার আগে রাজনীতিটা ভালো ক'রে বুঝে নিতে চেষ্টা ক'রো—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে চিন্তে কাজ কর, আবেগের বশবর্তী হয়ে, ছোট তাগাদার কাছে বড় প্রয়োজনকে বলি দিয়ো না। মনে রেখো দেশের সেবার জন্য যেমন সাহসেরও দরকার তেমনি শিক্ষা ও সংযমেরও দরকার।

মোট কথা, শোভাযাত্রায় যাও নি বলে কী আর এমন হয়েছে! আরও কত উপায়ে দেশের প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পার। তোমাদের নাইট্ স্কুলে পড়াতে যাও না কেন? তোমার রাণীদিদিকে নাকি বলেছিলে যে পাছে বাড়ির লোকের অমত হয়, তাই যাবে না? এবার ত' দেখছি খুব বাধ্য মেয়ে! না দিদিমণি, দেশপ্রেমের প্রথম ধাপেই নিজের মতামতের এবং নিজের ন্যায়-অন্যায় কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চেষ্টা কর।

এতগুলো কথা বল্‌লাম বলে নিশ্চয় রাগ কর নি? ঠাকু'মাও তোমার ফ্রেণ্ড।

তোমাদের ক্লাশের ছেলেমেয়েরা কী রকম পড়াশুনা করে? আজকাল যে লেখাপড়ার কথা কিছুই বল না? মনে রেখো যে যদিও অনুষ্ঠান, খেলাধূলো, বক্তৃতা, ডিবেট্ ইত্যাদির একটা প্রয়োজন আছে, তবুও তোমাদের কলেজের এই চারটি বছরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা।

হোষ্টেলের নিয়ম পছন্দ না হ'লেও, যখন ভর্তি হয়েছিলে, ওঁরা নিয়মকানুন লিখে দিয়েছিলেন, সেসব জেনেশুনে ভর্তি হয়েছিলে। এখন তাই নিয়ে নালিশ করা কি শোভা পায়? খাওয়া দাওয়া যদি মনের মত না হয়, তোমাদের হোষ্টেল কমিটি আছে,

তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর, ভালো বন্দোবস্ত কর, কিন্তু কদাচ বাইরে গিয়ে, নিজের হোষ্টেলের নিন্দা ক'রো না।

তুমি সব দিক দিয়ে ভালো হও দিদিমণি, দেখে বুড়ো ঠাকু'মার চোখ জুড়োক্। ইতি।

ঠাকু'মা

সাত

সতেরো বছর বয়সে আমার নাতনী মণিমালা আই-এ পাশ করল। সাধারণ গুণের মেয়ে সাধারণভাবেই পাশ করল, খুব ভালোও না, কিছু মন্দও না। আই-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব নতুন বিপদের সৃষ্টি হল। মণিমালার মামীমার ভাই বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে ফিরে এল। মামীমা ধরে পড়লেন মণিমালার সঙ্গে তার বিয়ে দিতেই হ'বে। ছেলে খাসা চাকরী পেয়েছে, স্বভাবচরিত্র দেবতুল্য, রংটা একটু ময়লা হ'লেও পুরুষ মানুষের তা'তে কিবা এসে যায়। মণিও খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে, বাপের একমাত্র সন্তান, যা কিছু আছে সবই ওরই জন্য থাকবে। ছেলের বাপ অল্পবয়সেই স্বর্গে গেছেন, থাকার মধ্যে এক বিধবা মা, সব দিক দিয়েই ভালো হয়। ছেলের মা মণিকে বহুবার দেখেছেন, ছেলেও ছোট বেলায় দেখে থাকবে। মার খুবই আগ্রহ, মণির মামীরও আগ্রহ, মণির মা বাবারও বোধ করি একটু মন টলেছিল, যাই হোক্ পরীক্ষার ফল বেরোবার দু'চার দিন বাদেই কথাটা মণির কানেও পৌঁছল! সে ত' রেগে মেগে একাকার। সব কথা শুনে আমি লিখলাম :

স্নেহের দিদিমণি,

অত রাগ কিসের বল দিকিন ? তোমার আত্মীয়স্বজনরা দেখে-

শুনে তোমার জন্য দিব্যি ভালো পাত্র খুঁজে বের করেছেন, তাইতেই কি এত রাগ ? বলেছি ত' ঠাকু'মা তোমার ফ্রেণ্ড। বিয়েতে যদি সত্যি তোমার আপত্তি থাকে, সোজাসুজি কারণ দেখিয়ে বল, তোমার অমতে তোমার কখনই বিয়ে দেওয়া হবে না।

পড়াশুনোর কথা লিখেছ দিদিমণি। সে ত' খুব ভালো কথা। সত্যিই যদি বি-এ পাশ না ক'রে কিছু করবে না স্থির ক'রে থাক, আমি তোমাকে সমর্থন করব। কিন্তু সাবধান, পরে বল্‌তে পারবে না, ঐ অত বড় এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারত, ক্যায়সা সুখে থাক্‌তাম, কত বড় গাড়ি চড়ে বেড়াতাম, কেমন চমৎকার বাড়িতে বাস করতাম, সোনার খাটে ব'সে রূপোর খাটে পা রাখতাম—এই সব আত্মীয়স্বজনরা কিছু করল না বলে আমার এত সুখ হ'ল না!

তোমার মা, মামীকে দোষ দিও না। একটা ভালো সুযোগ পেয়েছেন, তোমার মঙ্গল চিন্তা ক'রেই বিয়ের কথা তুলেছেন। তোমার যখন অন্যরকম মতামত তখন কখনই জোর করে কেউ তোমার বিয়ে দেবে না। তবে কতকগুলো আজেবাজে কথাও লিখেছ। এবং আগেও আমি বলেছি, এখনও বল্‌ছি, দুনিয়াতে শতকরা আটানব্বই জন মেয়ে যখন বিয়ে করে তখন বিয়ে করাটাই স্বাভাবিক। এবং আমার মনে হয় উক্ত পাত্রটি যদি মোটা বেঁটে কালো না হয়ে ছিপ্‌ছিপে লম্বা ফর্সা হ'ত আর তার যদি বাঁশির মত নাক হ'ত, আর ধনুকের মত ভুরু হ'ত, তুমি কখনই অত আপত্তি করতে না। সে যাই হোক্ গে, লেখাপড়া শিখে, কাজকর্মই কর আর নিজে পছন্দ ক'রে বিয়েই কর, বা দুটো একসঙ্গেই কর, কোনটাই মন্দ হবে না।

তুমি লিখেছ মা খুব রাগ করেছেন, বলেছেন তোমার বন্ধু মিনু

নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করেছে বলে তোমাকেও ঐ রকম বেহায়াপনা করতে দেওয়া হ'বে না। না, মণি, তোমার মা'র সঙ্গে এখানে আমার মত মেলে না। তুমি লেখাপড়া শিখে, চিন্তা ক'রে, বিচার ক'রে, যদি কাউকে পছন্দ ক'রে বিয়ে কর, আমি তার মধ্যে কোনও বেহায়াপনা দেখ্তে পাই না। এবং আমি একথাও মানি না যে তুমি কিসে সুখী হ'বে, তোমার চেয়ে তোমার বাবা মা বেশী বোঝেন। এখন তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তোমার মন তুমিই সব চেয়ে বেশী বুঝবে, তোমার যদি বিয়েতেই অনিচ্ছা থাকে, বা কোনও বিশেষ পাত্রে অনিচ্ছা থাকে, নির্ভয়ে সেকথা প্রকাশ করবে, এবং নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও যাবে না। বিবাহ এমন একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধন, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে, যে সেখানে বিন্দুমাত্র ভুলের স্থান নেই।

তবে তুমি ছেলেমানুষ, কোন্ গুণ দেখে পছন্দ করবে আর কোন্ ত্রুটি দেখে প্রত্যাখ্যান করবে, তলিয়ে দেখা দরকার। এখন তুমি বিবাহে অমত করলে তোমার কথা রাখা হবে, কিন্তু তাই বলে বাবা মা'র মত না থাক্লে এখন তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। তুমি কী চাও না সেটা যত ভালো করে জানো, কী যে চাও সেটা তত ভালো ক'রে বোঝো কি না সন্দেহ। তার জন্য একুশ বছর বয়স অবধি অপেক্ষা করা দরকার। একুশ বছর হ'লেই যে রাতারাতি খুব তোমার বুদ্ধি বেড়ে যাবে তা বলছি না, তবে গড়পড়তায় মোটামুটি বলা যেতে পারে যে একুশ বছরের একটা মানুষের নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারা উচিত। পারে না অবিশ্যি সব সময়। ঝোঁকের মাথায়, সখের বশ হ'য়ে, আবেগের বশ হ'য়ে ভুল বোঝার দরুণ, কত না মারাত্মক ভুল ক'রে ফেলে।

সুখী হ'বার কোনও একটা অব্যর্থ মন্ত্র আমার জানা নেই

দিদিমণি। কিন্তু নিজে যদি দেখেশুনে বিয়ে কর, তা'র রূপগুণ ছাড়া, তিনটি সাদামাটা ঘরোয়া বিষয়ে লক্ষ্য রেখো ঃ যেন তার স্বাস্থ্যটি অটুট হয়, চরিত্রটি সৎ হয়, এবং অবস্থা মোটের উপর সচ্ছল হয়। বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হ'ল একটি পরিবার গঠন করা, ঐ তিনটি উপকরণ না থাক্‌লে সে বিষয়ে বাধা পড়বে।

অনেক লম্বা চিঠি হ'য়ে গেল, অথচ তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'ল না। তোমার দাদুকে বিয়ে করতে আসলে কেন রাজী হয়েছিলাম জান? তাঁর কানের উপরে চুলগুলো কেমন গুছিগুছি হ'য়ে গজিয়েছে, একবার দেখবার পর আর আমার কোনও আপত্তিই রইল না। ইতি।

ঠাকু'মা।

চিঠিখানা ও সময়ে না লিখলেও চল্‌ত, কারণ এর পরেই শোনা গেল সৎ পাত্রটি বিলেতেই একজন বিড়ালাক্ষী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ ক'রে এসেছেন, বল্‌তে ভয় পাচ্ছিলেন, এই সুযোগে কথাটা ফাঁস করে দেবার একটা অবকাশ পেয়ে তিনিও বাঁচলেন, মণিমালাও বাঁচল।

তারপর মণি বি-এ ক্লাশে ভর্তি হ'ল। একটুও যে ওর মধ্যে পরিবর্ত্তন হয় নি সেকথা যেন কেউ মনে না করেন। আমার বারো বছরের নাত্‌নী যেমন ঠাকু'মার কথা বেদবাক্য ব'লে মেনে নিত, আমার সতেরো আঠারো বছরের নাত্‌নীও যদি তাই করত, তা'হলে আমার সুখ না হ'য়ে দুঃখই হ'ত। তার বয়সের ও আমার বয়সের মাঝখানে যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর প্রবাহিত হয়েছে, তার

যদি কোনও চিহ্ন না থাকত, দুনিয়ার উপর আমার বিশ্বাস চলে যেত। কিন্তু তবুও মণি তার তরুণ বয়সের সমস্যাগুলোকে আমার প্রবীণ চোখ দিয়ে যাচাই ক'রে নিত। এখনও নেয়।

বি-এ পড়তে পড়তে ওদের কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের কী একটা গুরুতর মতভেদের ফলে কলেজে বিষম ষ্ট্রাইক্ হ'ল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ছেলেরা সিঁড়ির উপর সারি সারি শুয়ে থাকে, কাউকে ঢুকতে দেবে না। মেয়েরা অন্য মেয়েদের আঁচল ধরে টেনে তাদের আট্‌কায়। মণি পড়ল দোটানায়, তাদের বাড়ী থেকে লিখে পাঠাল ক্লাশ যখন হচ্ছে না তখন গোলমালের মধ্যে না থেকে বাড়ি চলে এসৈ, আবার মিট্‌মাট হয়ে গেলে ফিরে যাবে। এখন হোষ্টেলে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। মণির আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্‌ল, এমন সঙ্গীন অবস্থাতে স্থানত্যাগ করে ভীরুর মত চলে যেতে কিছুতেই সে রাজী নয়। আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে লিখ্‌ল। মনে হ'ল যেন কর্তৃ-পক্ষের কিঞ্চিৎ অন্যায় হয়েছিল, যেন যথেষ্ট খোঁজখবর না নিয়েই লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের আচরণের আমি প্রশংসা করতে পারলাম না, মণিকে লিখ্‌লাম ঃ

স্নেহের মণি,

জীবনযাত্রা সব সময়ে সুগম পথে হয় না, একথা মানি। অনেক সময়ে গুরুতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হ'লে গুরুজনদের বিপক্ষে দাঁড়াতে হ'তে পারে, একথাও আমি মানি।

কারণ বিবেকের আদেশ গুরুবাক্যের চেয়েও বড়। কিন্তু গুরু-স্থানীয় যাঁরা তাঁদের অপমান করলে, কী করে তোমাদের আত্মসম্মান রক্ষা হয় একথা বুঝ্‌লাম না। এবং আজ যাঁকে উদ্দেশ ক'রে অমন কটু বাক্য এবং রূঢ় আচরণ করলে, আগামী মাসে যখন গোলমাল চুকে যাবে, তাঁরই চরণপ্রান্তে বসে কী ক'রে পরীক্ষা পাশের পড়া নেবে তাও বুঝ্‌লাম না। তুমি কি বল্‌তে চাও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হ'লেই শীলতাজ্ঞান হারাতে হবে? তারপর যুক্তি দিয়ে যাকে পরাস্ত করতে পারলে না, বাহুবল দিয়ে যদি তাকে বশীভূত করতে চেষ্টা কর, তা' হ'লে যে বিদ্যার্থীর গৌরব হারিয়ে পশুর স্তরে নেমে যাবে।

অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ক'রো, মিটিং ক'রো, কমিটির কাছে দাবী ক'রো, কিন্তু গুরুজনের গলায় জুতোর মালা দেওয়া যে নিজের বাবামা'র গলায় জুতোর মালা দেওয়ার সমান। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

এই ব্যাপার নিয়ে মণিমালার সঙ্গে মেলা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। তার শেষ হ'ল যখন কলেজে একটা মিট্‌মাট হয়ে গেল। ছাত্ররাও কিছুটা ছেড়ে দিল, কর্তৃপক্ষও তাঁদের যেখানে অন্যায় হ'য়ে গিয়েছিল সেটা সংশোধন ক'রে নিলেন। তখন মণিমালাকে লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

তোমাদের গণ্ডগোল মিটে গিয়ে আবার নিয়মিত ক্লাশ হচ্ছে

শুনে খুসি হ'লাম। যাঁদের হাতে বিদ্যা লাভ করছ তাঁদের ঋণ যে কোনও দিনও শোধ করা যায় না সেটুকু নিশ্চয় এতদিনে বুঝতে পেরেছ। তাঁরা যে তোমাদের শত্রু ন'ন্, বরং তোমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এও নিশ্চয় জান। কা'কে শ্রদ্ধা করবে আর কা'কে করবে না জান্‌তে চেয়েছ। যাঁরা শ্রদ্ধেয় কেবলমাত্র তাঁদের শ্রদ্ধা করবে। অযোগ্যকে ভক্তি দান করা নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করা। আমার অনেক সময় মনে হয় যে আমরা যে পাত্র নির্বিশেষে গুরু সম্পর্কীয়দের পায়ের ধূলো নিয়ে থাকি, এটা উচিত নয়। যা'কে অশ্রদ্ধেয়, ভক্তির অযোগ্য বলে চিন্‌তে পেরেছি তা'কে কেন মেকি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব? তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব, ভালো ব্যবহার করব। এই পর্যন্ত। এর থেকে বাধ্যতার কথা ওঠে। তোমাকে এর আগেও একবার লিখেছিলাম যে নিজের ন্যায়বোধ অনুসারে কাজ করবে। এমন কি তোমার ধর্মবোধের কাছে তোমার বাবামা'র আদেশেরও সরে দাঁড়ানো উচিত। তুমি একটা আলাদা মানুষ। একটা বয়সের পর, তোমার পাপপুণ্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজেকে নিতে হ'বে, তখন আর চোখ বুজে কারো কথা শোনা উচিত নয়, নিজের মনের আদেশ ছাড়া। তোমার মাষ্টার মশাইরা যা বলেন, সেটা যদি তোমার অন্যায় ব'লে মনে হয়, গুরুবাক্য হ'লেও তাকে গ্রহণ ক'র না। তবে সর্বদা মনে রেখো যে তুমি জ্ঞানবুদ্ধিতে অপরিণত, কাজেই তোমার ভুলও হ'তে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থেকো।

তোমার বন্ধু মিনু পালিয়ে গিয়ে বাপমা'র মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছে লিখেছ। মিনুর সঙ্গে আমার অনেকখানি সহানুভূতি থাক্‌লেও আমার মনে হয় সে উচিত কাজ করে নি।

প্রথমতঃ সে বয়সে এখনও নাবালিকা। আর দুটো বছর তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। ততদিনে পড়াশুনোও আরও খানিকটা এগোত, বয়সটাও কিছুটা বাড়ত, আর মনেরও একটা পরীক্ষা হয়ে যেত। তারপরও যদি তার বাপমার অনুমতি না পেত, তখন যদি সে নিজে সব দায়িত্ব নিয়ে নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করত, আমি খুব খুসি হ'তাম। কারণ ওর বাবামা'র আপত্তি করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। এমন কি, যদি তাঁদের মতের একটা সঙ্গত কারণ থাক্তও, আর মিনু তবু জেনেশুনে বিবাহ করত, তাঁরা তাকে পরামর্শ দিতে পারতেন, বাধা দিতে পারতেন না। আমার মতে মিনু একটা অযথা তাড়াহুড়ো করল। যতদিন সে নাবালিকা আছে, তার বাবা তার জন্য দায়ী, তাঁকে লঙ্ঘন করে কাজ করবার কী এমন প্রয়োজন ছিল ? তোমাকে এতগুলো কথা লিখ্লাম, কারণ নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে বরাবর তোমাকে পরামর্শ দিয়ে এসেছি, সেই সঙ্গে আমার একথাও মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে অপরের ন্যায্য অধিকারটুকুকেও যথাসম্ভব মেনে চলা উচিত।

তাছাড়া বড়রা যাই বল্বেন তারই প্রতিবাদ করতে হ'বে, এও ত' বুদ্ধিমানের যুক্তি নয়। যারই স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ আছে, সে-ই ন্যায় আইন মেনে চলে। এবং যে-ই স্বাধীনতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে-ই অপরের সাহায্য দাবী করার অধিকার ত্যাগ করেছে। তোমার মিনু ত' ঐ অশোকটিকে বিয়ে করে চন্দন-নগরে অশোকের মাসির বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রইল। এখন অশোকের মাসি ত' আর ওদের চিরকাল পুষবে না, অশোক সবে মাত্র কাজে ঢুকেছে, গোটা একটা সংসার সামলানো ওর পক্ষে মুস্কিল, এখন মিনু কি আশা করবে যে ওর বাবা-মা, যাঁদের অমতে ও

বিয়ে করেছে, তাঁরাই ওকে সাহায্য করবেন? অশোকের বাবামা ত' সহজে করবেন না, কারণ আমাদের সঙ্গে ওঁদের যাতায়াত আছে, আমি ওর বাবাকে বল্‌তে শুনেছি, অশোকের সঙ্গে দেখা হ'লে ওর হাড়গোড় আস্ত রাখবেন না! যদি মিনু কয়েক বছর কষ্ট করতে প্রস্তুত থাকে, আমি ওকে শ্রদ্ধা করব, কিন্তু তবুও বল্‌ব বুদ্ধির কাজ করে নি। তুমি ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছ ত? নইলে আর বন্ধু হ'লে কিসে? জান ত' দুঃখীদের ইতর ভদ্র নেই। মিনু যদি আমাদের সমিতিতে গান শেখাতে রাজী থাকে, কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন হয়। একবার জিজ্ঞাসা ক'রো। অনেক ভালোবাসা নিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

আট

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার নাত্‌নী মণিমালা বি-এ পাশ করে ফেল্‌ল। উনিশ বছর তার বয়স, লম্বা, দোহারা গড়ন, মাথায় এক-রাশি কালো কোঁক্‌ড়া চুল, গায়ের রংটি স্নিগ্ধ শ্যামল, ছোটবেলা-কার সেই চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় কেবল তার চোখের দৃষ্টিতে, নইলে চলনে বলনে একটা গাম্ভীর্য। একটু আধটু দলে পড়ে গাইতে পারে, সেলাই টেলাইও কিছুটা জানে, মোটামুটি রাঁধাবাড়াও জানে। আমার নাত্‌নীর সাম্‌নে সীমাহীন বিশ্ব ইঙ্গিতে তাকে আহ্বান করে। আমি তাকে লিখ্‌লাম—

স্নেহের দিদিমণি,

তোমার পাশের খবর শুনে আনন্দ রাখবার জায়গা পাই না। তোমার দাদু ত' পাঁচসাত জনা বন্ধুবান্ধব জড়ো ক'রে ফেল্‌লেন, সবাই মিলে পোলাও কালিয়া খাওয়া হ'ল।

এবার তুমি সত্যি বড় হ'য়ে গেলে। এখন কী করবে ঠিক করেছ? আমি নিশ্চয় জানি ইলা শীলার মত তুমি বিয়ের আশায় বাড়িতে বসে থাক্‌বে না। ভালো কথা, ওদের কাছ থেকে একটু চুল বাঁধা শিখে নিও ত'। কেমন ছিরি ছাঁদ মেয়ে দুটির সাজগোজে, দেখে ভালো লাগে। সব দিক দিয়ে চৌকোস্‌ হ'য়ো দিদিমণি, দেখতে শুন্‌তে ছিম্‌ছাম্‌ হওয়া একটা কর্তব্য, শুধু বিলাসিতা নয়।

অতিরিক্ত সৌখীন হবার কথা বল্‌ছি না, কিন্তু ইংরাজিতে যা'কে বলে স্মার্টনেস্‌, বেশভূষা কথাবার্তাতে তাই যেন প্রকাশ পায়। ওর সঙ্গে মনের পরিচ্ছন্নতার একটা সংযোগ আছে; যার বাইরেটা আনাড়ি, তা'র মনের মধ্যেও একটা আল্‌গোছ আনাড়ি ভাব থাকা সম্ভব। বিশেষ ক'রে যদি কর্মক্ষেত্রে নামো, আনাড়ি হ'লে কী ক'রে চল্‌বে।

তুমি লিখেছিলে কোন্ কোন্ কাজ মেয়েরা করতে পারে। শিক্ষয়িত্রীর কাজ ত' মেয়েরা চিরকাল ক'রে আস্‌ছে, তা ছাড়া নার্সিং আছে, যেটা এখনও শিক্ষিত মেয়েরা আমাদের দেশে ভালো চোখে দেখে না, কিন্তু যার মত মহৎ কাজ কমই আছে। তারপর ষ্টেনোগ্রাফি আছে। ডাক্তারির দিক্‌টা ত' তোমার বন্ধ, সায়েন্সই পড়লে না! যাই কর, তার জন্য তৈরী হ'তে হ'বে, বিশেষ ট্রেনিং নিতে হ'বে।

এসব ছাড়াও অনেক রকম শিল্পকাজ আছে, কারিগরী কাজ আছে, যা'র জন্য তোমার বি-এ পাশ করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু বি-এ পড়াতে যেদিকেই যাও না কেন তোমার লাভ বই ক্ষতি হ'বে না। তবে কিনা আমার মনে হয় হাতের কাজ করতে গেলে খানিকটা হাতের গুণও থাকা দরকার।

তোমার মা বাবা নিশ্চয় বিয়ে থা'র কথা ভুল্‌তে পারছেন না। তাঁদের ব'লো বিয়ে যে কখনই করবে না, এমন কথা ত' নয়। তবে এখনি যেমন ক'রে হোক্ একটা বিয়ে করতেই হ'বে, এবং যদ্দিন না হয় তা'র জন্য হাপিত্যেশ করতে হ'বে এটা কোনও কাজের কথা নয়।

তারপর আরেকটা কথা হ'ল, আজকাল যে রকম চারদিকে দেখ্‌ছি, প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীর নিজের সংস্থানটুকু নিজে ক'রে

নেবার ক্ষমতা থাকা নিতান্ত দরকার। বিয়ে হ'য়ে গেলেও দরকার। স্বামী যদি এক বছর রোগে ভোগে বা চাক্‌রী যায়, বা কোনও একটা বিপদ্ আপদ্ হয়, তখন স্ত্রী যা'তে অকূল পাথারে না পড়ে, তা'র ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মাবাবার কর্তব্য, সে যে যাই বলুক্। আমাদের কেমন যেন একটা ভুল দৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আমরা মনে করি যে মেয়েরা যদি কাজকর্ম ক'রে অর্থোপার্জন করে, সেটা তাদের পরিবারের পুরুষদের উপর একটা ছায়াপাত করে, যেন ছুটো একটা বোন কি মেয়েকে প্রতিপালন করবার তাদের ক্ষমতা নেই। এই চিন্তাধারাটাই ভুল। এতে মেয়েদের অমর্যাদা করা হয়। তা'দের চিরকালের মত পরমুখাপেক্ষীর আসন দিয়ে দেওয়া হয়। যেন মেয়েদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া নিন্দনীয়, এই রকম একটা ভাব থাকে। তুমি যদি শিক্ষিত ও সমর্থ হও, তা' হ'লে পরমুখাপেক্ষী হওয়া একজন পুরুষ মানুষের পক্ষেও যতটা নিন্দনীয়, তোমার পক্ষেও তাই।

এই সব কথা মনে রেখে, মন স্থির কর। এম্-এ পড়ার কথা উঠেছে শুন্‌লাম। যদি পড়, নিরুদ্দিষ্ট ভাবে প'ড়ো না, কী উদ্দেশ্যে কোন্ বিষয় পড়বে আগে স্থির কর। কী ঠিক হ'ল না হ'ল আমাকে সবিশেষ জানিও।

এই সঙ্গে তোমার জন্য আমার দিদিশাশুড়ীর নব-রত্নের মালা পাঠালাম। এর মধ্যে কোনও মন্ত্রশক্তি লুকোনো আছে ব'লে বিশ্বাস করি না কিন্তু এটিকে আমার শুভ কামনার নিদর্শন ব'লে গ্রহণ কর, আমিও যেমন আমার দিদিশাশুড়ীর হাত থেকে নিয়েছিলাম। তোমার উত্তরের আশায় রইলাম। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

আরও কিছুদিন পরে মণিকে আবার পত্র দিলাম। বল্‌লাম, দিদিমণি, তুমি বি-টি পড়াই স্থির করলে শুনে অত্যন্ত খুসি হ'লাম। আমি হ'লে গুপীর কথায় ঘাব্‌ড়াতাম না, মাষ্টারনী হ'বার মত বিদ্যে যে ওর কোনও জন্মে হ'বে তা আমার মনে হয় না, কাজেই ও ত' নাক সিঁটকোবেই, তা'তে কার কি বা এসে যায়। শিক্ষাদান করা একটা ব্রত, আর তার জন্য তুমি নিজেকে প্রস্তুত করছ জেনে ভালো লাগ্‌ছে।

তবে এবার এক্‌লা চলাফেরা অভ্যাস ক'রে ফেল। ট্র্যামে-বাসে যাতায়াতে, একলা পথে হাঁটাতে আর ত' তোমাদের সম্ভ্রম হারাবার ভয় নেই। আমরা ছোটবেলায় পাঁচ মিনিটের পথ দূর থেকেও বাসে ক'রে স্কুলে যেতাম, নইলে গুরুজনদের ভাবনা হ'ত। ঐ গুরুজনদের মনের শান্তির ব্যবস্থা করতে গিয়ে ছেলেমানুষদের আর কোনও রকম উন্নতিরই উপায় থাক্‌ত না। দোকানে গিয়ে কোনও একটা জিনিস নিজে কিনে আনা ত' একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। তোমরা আর কারও মুখ চেয়ে থাকো না, তোমরা কত সুখী বুঝ্‌তে পার ?

অনেকেই হয় ত' তোমাকে বলবে "এ মা, শেষটা, এত কাজ থাক্‌তে সেই পুরোন মাষ্টারিই বেছে নিলে !"—কিছু শুনো না। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যারা শিক্ষা দেয়, দেশের ভবিষ্যৎ তারাই গ'ড়ে তোলে। একটা মস্ত বড় কাজে তুমি হাত দিচ্ছ, তার সমস্ত দায়িত্বটা আশা করি তুমি বুঝ্‌তে পারছ ?

নিজের ছেলে মানুষ করা বরং সহজ, কারণ স্নেহ অনেক সময় মানুষের তৃতীয় নেত্র ফুটিয়ে দেয়, কিন্তু পরের ছেলে মানুষ করা অনেক কঠিন, তা'র অনেক দুঃখ, অনেক আনন্দ। প্রথমেই নিজেকে ন্যায়-পরায়ণা হ'তে শেখাও, ক্ষমাশীলা হ'তে শেখাও,

সত্য-নিষ্ঠ হতে শেখাও। তারপর দেখ্‌বে কায়দাকানুনগুলো অনেক বেশী সহজ মনে হবে। সমস্ত খবর দিয়ে আমাকে চিঠি লিখো। ভালোবাসা নিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

মণিমালা বি-টি ক্লাসে ভর্তি হ'ল, হোষ্টেলেই আবার থাক্‌তে হ'ল। এখন আর তার মুখে হোষ্টেলের সমালোচনা শোনা যায় না, বরং আমরা কেউ কিছু বল্‌লে ভারী রাগ করে। হোষ্টেলে ওদের দুটি দল হ'ল, একদল সব কিছু দিশী মতে করতে চায়, তারা বলে যা' কিছু বিদেশী সব কিছু দাসত্বের চিহ্ন এবং বর্জনীয়। অন্য দল বলে কেবলমাত্র দিশী নিয়ম আঁকড়ে থাক্‌লে কূপমণ্ডূক হয়ে যায়, অতএব যার কাছে যা কিছু ভালো পাওয়া যাবে, সব নেব। মণির মনটা দ্বিতীয় মতটাকেই সমর্থন করে। এ বিষয়েও আমার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম—

"মাইকেল মধুসূদন যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁরা একদল নব-পন্থী ছিলেন, অধিকাংশই পরম পণ্ডিত ডিরোজিওর ছাত্র এবং শিষ্য। তাঁরা বল্‌তেন দিশী আদবকায়দা, নিয়মসংস্কার ত্যাগ ক'রে, বিলিতী রীতি ধরতে হ'বে, কারণ দেশী ঐতিহ্যের যে কি বিষময় ফল সে ত' চোখের সম্মুখেই দেখা যাচ্ছে। এঁদের বিপক্ষে যে প্রাচীনপন্থীরা ছিলেন, তাঁরা পুরোন নিয়মগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন ও নতুন যা কিছু সবটাকেই সন্দেহের চোখে দেখ্‌তেন। ইতিহাস উভয় পক্ষের ভুলের সাক্ষ্য দিতে পারে। সেই নবীন দলের মধ্যে মাইকেল অমরত্বের

উত্তরাধিকারী হ'লেন, পুরোন রামায়ণের অতি পরিচিত মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী লিখে। এ কথা মনে রেখো।

কেউ কোনওদিনও চোখ বুঁজে প্রাচীনকে জড়িয়ে ধরে থাক্লে উন্নতির পথে এগোতে পারবে না। আবার দিশী জিনিসমাত্রকেই দেখে যারা নাক সিঁট্কোয় তারা নিজেদের পায়ের তলা থেকে নিজেরাই মাটি কেটে সরিয়ে ফেলে। এমন ভাবে নিজেদের তৈরী ক'রো যা'তে বিশ্বসভার প্রথম শ্রেণীতে দাঁড়াতেও পারবে, আবার যে একবার দৃষ্টিপাত করবে সে-ই তোমাদের ভারতবর্ষের সন্তান ব'লে চিন্তে পারবে। নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ ক'রো, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বটুকু হারিও না।

কোন্ পক্ষের জিত হ'ল জানিও। ভালোবাসা নিও। ইতি।

ঠাকু'মা।

এই চিঠির উত্তরে মণি যে চিঠি লিখেছিল, এখনকার দিনে তার একটা বিশেষ মূল্য থাক্ত, কারণ শিক্ষার একটা আধুনিক সমস্যার কথা সে তুলেছিল। বি-টি পড়তে গিয়ে, নানান্ স্কুলে ঘুরে ঘুরে ক্লাশ নিতে হ'ত। দিশী স্কুলের বেশীর ভাগেই দেখ্ত সব ক্লাশেই বাংলায় পড়ানো হয়, দু' এক জায়গায় নীচের ক্লাশে বাংলায় উপরের ক্লাশে ইংরিজিতে আর সাহেবী স্কুলে ত' সব ক্লাশেই ইংরিজিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শুন্ত যে ইংরিজিতে শিক্ষা দেওয়া আমাদের দীর্ঘ কালের দাসত্বের চিহ্ন, ওটার পরিবর্তন করতে হ'বে। আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম—

"ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের ইংরিজিতে শিক্ষা দেওয়া দাসত্বের স্মৃতি-চিহ্ন হ'লেও, তার থেকে খানিকটা লাভও হয়েছে। যদি

সেই দাসত্ব থেকে আমাদের স্থায়ী লাভ কিছু হয়ে থাকে, সে হচ্ছে ইউরোপীয় শিক্ষা ও কৃষ্টির সঙ্গে ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে, নিগূঢ় পরিচয়। অতএব ইংরিজি ভাষা জানি বলে লজ্জিত হ'বার কিছু নেই। আমাদের লজ্জার কথা ত' ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় অক্ষরে লেখা হ'য়ে গেছে, যে ইতিহাস পড়বে সেই জান্‌বে। গোপন করবার ত' উপায় কিছু নেই। বরং ঐ দাসত্ব থেকে যদি ভালো কিছু উদ্ধার ক'রে থাকি, সেটুকুই আমাদের লাভ। তবে বাংলা শিক্ষার অনিষ্ট ক'রে নয়। বাংলার মাধ্যমেই স্কুলের শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু ইংরিজি ভাষা বর্জন করলে আমাদের সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে, তাদের শিক্ষার মধ্যে একটা দৈন্য থেকে যাবে। যদি সমগ্র ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা থাকৃত, তা' হ'লে দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান সেই ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে, ভারতবর্ষের সন্তানদের হাতে দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নেই, যখন কেবলমাত্র মুষ্টি-মেয় কয়েকটি প্রাণী বাংলা ভাষা শিক্ষা করে, তখন আমাদের যা' কিছু সম্পদ্‌ বাংলা ভাষায় আবদ্ধ করে রাখ্‌লে অন্যায় হ'বে। দুনিয়ার লোকে তার পরিচয় পাবে না, সে বড় দুঃখের কারণ হ'বে। আমরা নিজেরা না দিলে কেই বা আমাদের অমূল্য সাহিত্যের কথা বিশ্বের চোখের সাম্‌নে প্রকাশিত করবে? সেইজন্য ইংরিজি শেখার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া জ্ঞান কি কখনও দাসত্বের চিহ্ন হয়? জ্ঞান হ'ল বিজয়ীর ললাটের জয়তিলক। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সমুদয় রচনার ইংরিজি অনুবাদ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। ইতি।

ঠাকু'মা"

বি-টি পড়তে পড়তে মণিমালার কয়েকটি সহপাঠী বন্ধু জুটেছিল। তারা পুরুষজাতীয় হওয়াতে, মণিদের বাড়িতে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। মণি ভারী দুঃখ ক'রে আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিল, তার উত্তরে আমি লিখ্‌লাম—

স্নেহের দিদিমণি,

তোমাদের বাড়ির লোকরা ভুল বলেছে। অনাত্মীয় পুরুষ ও নারীর মধ্যে একমাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ছাড়া অপর কোন সম্বন্ধ হ'তে পারে না, একথা যারা বলে তা'দের চিত্তের ঐ একটা দিকই ফুট্‌তে পেরেছে, অপর দিকটা পারে নি। যখন মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকৃত, তখন কন্যা ভগ্নী পত্নী মাতা রূপে ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধের সুযোগই ছিল না, একমাত্র অবৈধ সম্বন্ধ ছাড়া। এখন সেদিন চলে গেছে, এবং যে কালেই, যে দেশেই অবরোধ প্রথা থাকে না, তখনই সেখানে নারীদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে থাকে, এবং নারীকে অনাত্মীয়ের বন্ধুরূপেও দেখতে পাওয়া যায়। যা'রা এ কথা মানে না, সত্যি কথা বল্‌তে কি, মনে মনে তারা নারীজাতিটাকেই ঘৃণা করে।

তবে কিনা বাড়াবাড়ি ক'রো না, দৃষ্টিকটু কিছু ক'রো না, সমাজে বাস করছ, অসামাজিক আচরণও ক'রো না, নিজের আত্মসম্মান রক্ষা ক'রে চল। যাদের সঙ্গে একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করছ, পরে যাদের সঙ্গে হয়ত' সহকর্মী-রূপে কাজ করতে হ'বে, তাদের সঙ্গে সৌহার্দ রক্ষা করাই ত' কর্তব্য। কিন্তু কোনওরকম আতিশয্য নয়, ন্যাকামি নয়। এর আগেও তোমাকে বলেছি, কেবল তোমার মনটা পাপশূন্য হ'লেই যথেষ্ট হ'ল না, সঙ্গে

সঙ্গে আচরণও এমন হওয়া চাই যা'তে লোকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম হয়। তবে যা'রা ইচ্ছা ক'রে নিন্দা করবে, তারা করবেই, তারা মেয়েদের কোনও কাজে কোনও দিনও যোগ দিতে চাইবে না। তাদের কথায় কান দিতে নেই। বিলেতে কি করে না করে তাই দিয়ে, দিদিমণি, আমাদের কী হবে? তাদের নিয়ম পালন ক'রে তাদের দেশ কী এমন সুখের উত্তরাধিকারী হ'ল বল? আমরা যেন আমাদেরই নিয়মে আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। ইতি।

ঠাকু'মা।

নয়

যখন মণিমালার প্রায় একুশ বছর বয়স, তখনও তার বিয়ে হয় নি। কেমন ক'রে জানি বাবামা'র মত করিয়ে, বি-টি পাশ করবার পর, সে পাহাড়ে স্কুলে একটা চাক্‌রী জুটিয়ে, গরম জামা-কাপড়, ওভারকোট, বর্ষাতি, ছাতাটাতা সব কিনে, বাক্স প্যাঁট্‌রা গুছিয়ে সেখানে যাত্রা করল। যদিও মা বাবাকে ছেড়ে হোষ্টেলে বাস করা তা'র অভ্যস্ত ছিল, তবুও এ একটা নতুন ধরনের ছাড়া-ছাড়ি হ'ল। এখন বাবামা'র সঙ্গে স্নেহের বন্ধনটা রইল, অর্থের নির্ভরটা চলে গেল।

মণি যে কি খুসি হ'য়ে কেনাকাটা সারল সে আর কী বল্‌ব। তখন আমি কিছুদিন ওদের কাছেই ছিলাম, আমাকে নিয়ে নিয়ে খানিকটা দোকানে দোকানে ঘুরল। তারপর একদিন সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল, সমস্ত বাঁধা ছাঁদা শেষ হ'ল, শীতকালও ফুরিয়ে গেল, আর আমাদের মণিমালা একদল সহকর্মীর সঙ্গে যাত্রা করল। ওর মা খানিকটা কান্নাকাটি করেছিল, একমাত্র মেয়ে হ'লে যেমন হয়। মণিরও তাই দেখে শেষ পর্যন্ত চোখে জল এসেছিল। যাই হোক্, সেখানে গুছিয়ে বসে মণি ত' আমাদের সকলকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করল। আমাকে লিখ্‌ল—

"আমাদের বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোধ হয় কোথাও তিনতলা বাড়ি তুল্‌ছেন, অন্তত আমার নতুন বন্ধু নলিনী তাই বলে। সেইজন্য আমাদের মোটে খেতে দেন না। তাছাড়া ওঁর বয়স হয়েছে,

মোটা হয়ে গেছেন, দাঁত নড়ে গেছে, হাঁট্‌তে পারেন না ব'লে আমরা আর পাঁচ জনা সাজগোজ ক'রে বেড়াতে বেরোলে রাগ করেন। বলেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরতে হবে, বলেন তোমাদের বাবা মা'রা কখনই এসব পছন্দ করতেন না। কেউ খুসি হচ্ছে দেখ্‌লে উনি রেগে যান। ওঁকে কেউ বিয়ে করে নি বলে সারা পুরুষ জাতটার উপর উনি হাড়ে চটা। বলেন ওরা সাপের মত, নেক্‌ড়ে বাঘের মত, কোথায় কোন্ শিকার আছে তাই সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকে। অচেনা পুরুষ মানুষের দিকে তাকাবে না পর্যন্ত আর চেনা হ'লেও পথে ঘাটে দেখা হ'লে কথাটি বল্‌বে না। আচ্ছা, এমনধারা মানুষকে নিয়ে কী করা যায় বল ত'?"

আমি তার উত্তরে লিখ্‌লাম—

স্নেহের দিদিমণি,

তোমাদের বোর্ডিংএর হেমলতাদিদির সঙ্গে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়কার বিলেতের লোকদের একটা সাদৃশ্য আছে। তবে কি জান মণি, ষাট বছর আগেকার বিলিতী সমাজের সঙ্গে আমাদের এখনকার দিশী সমাজের সত্যিই একটা মিল আছে। বিশেষ ক'রে মেয়েদের সম্বন্ধে। সে সময় যে সব মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগারপাতি করত, ওদের সমাজও তাদের খানিকটা সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ত, এবং তাদের নৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ত। আমাদের দেশে এখন যেমন হয়। আসলে সে সময় তারা স্ত্রীস্বাধীনতা জিনিসটাকেই পছন্দ করত না, সেটাকে একটা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করত, এখন

আমাদের দেশে যেমন করে। আর যে মহিলারা স্বাধীন জীবন যাপন করতেন তাঁরা জানতেন যে সমাজের চোখে, ন্যায়ভাবেই হোক্ বা অন্যায়ভাবে হোক্ তাঁদের পদমর্যাদা কতকটা কমে গেছে ; স্বামী অভাবে বাপ কি ভাইএর ঘাড়ে চাপ্‌লে যতটা শ্রদ্ধা তাঁরা পেতেন, বাপ-ভাইকে রেহাই দিয়েছেন ব'লে, এখন আর ততটা পাচ্ছেন না। কাজেই তাঁদের মনের মধ্যেও আপনা থেকেই একটা আত্মরক্ষার পাঁচিল তৈরী হয়। আর তুমি যে ঐ সব অতিশয় সতর্কবাণীর কথা লিখেছ, সে হ'ল ঐ আত্মরক্ষাটার বাইরের প্রকাশটুকু। অতএব হেমলতাদিদিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে হ'বে। তারপর ঐ সাবধান হ'তে হ'তে অনেক সব মনগড়া ভয়ভীতি এসে ভিত করেছে, যেখানে ভাবনার কোনও কারণ নেই সেখানেও বিপদের ছায়া দেখ্‌তে পান। এই পনেরো কুড়ি বছরে কালের যে কত পরিবর্তন হয়েছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। কিন্তু এও সত্যি যে আজও আমাদের দেশের অনেকেই মেয়েদের স্বাধীনতায় আশঙ্কার কারণ আছে ব'লে মনে করে ! এখন তোমরা যদি উভয় দিক রক্ষা ক'রে, তাদের এই ভুলটা ঘুচিয়ে দিতে পার, দেশের একটা বড় উপকার হয়। কারণ যে রকম দিনকাল, পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও কিছু উপার্জন না করলে আর সংসারই চলে না। কত সময় দেখা যায় মেয়েরা ঘরে বসে খেতে পায় না, ওদিকে পুরুষরা খেটে খেটে সারা, কিন্তু তবুও মান হারাবার ভয়ে মেয়েরা বাইরে বেরোবে না। এটা ঘুচিয়ে দাও। প্রমাণ ক'রে দাও যে মেয়েরা নিজেদের নারীত্বের গৌরব না হারিয়েও স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে। যে নারীত্ব বাইরের একটু খোলা হাওয়া লাগ্‌লেই ভেঙ্গে পড়ে তা'র মূল্য কতটুকু ? যুগে যুগে পৃথিবীতে কত মেয়েরা কত মহৎ কাজ ক'রে গেছে,

তোমরা তাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী সেটা প্রমাণ ক'রে দাও, সমস্ত নারীজাতি তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে থাক্‌বে। ইতি।

এই বিষয় নিয়ে মণির সঙ্গে আরও চিঠিপত্র চলেছিল। একবার তাকে লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

মেয়েরা কোনও বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে হীন নয় প্রমাণ করতে গিয়ে যদি পুরুষদের অনুকরণ করতে যাও, তাহ'লে সেই মুহূর্তেই মেয়েদের হীনতা প্রমাণ হ'য়ে যাবে। নারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে "কল্যাণী" শব্দও উচ্চারণ হয়ে থাকে, সেটা ভুলো না। যে অসাবধান উচ্ছল ব্যবহার পুরুষজাতের মধ্যে দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, মেয়েরাও যদি তাদের সমান হ'বার চেষ্টায় সেটার নকল করে, তবে তাদের বুদ্ধিহীনতার আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। তোমাদের চলাফেরাতে সর্বদা একটা সৌন্দর্য একটা গাম্ভীর্য থাকুক। তোমাদের আনন্দের সহজ বিকাশ হোক্, কিন্তু খেলোভাবে নয়। জেনে রেখো নিজের আচরণকে নিজে যতখানি মর্যাদা দেবে, আর পাঁচজনা কদাচ তার চেয়ে বেশী দেবে না।

ছেলেরা দলে দলে পথ জুড়ে চেঁচামেচি করতে করতে পথে হাঁটে ব'লে মেয়েরাও তাই করলে দৃষ্টিকটু হবে বৈ-কি। যেমন মেয়েরা গোল হ'য়ে বসে, হাতে সেলাই নিয়ে, নীচু গলায় গল্পগুজব হাসাহাসি করে ব'লে, একদল ছেলেও তাই করলে দৃষ্টিকটু হ'বে।

দুই জাতের সমান মূল্য হ'লেও, তারা ভিন্ন জাতির। অতএব স্বাধীন হ'তে গিয়ে নারীত্ব হারিও না। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

সেই স্কুলে মণিমালা দেড় বছর চাকরী করেছিল। এর মধ্যে তা'র অনেক অভিজ্ঞতা লাভও হয়েছিল। প্রথমেই সে শিখল পুরুষ মানুষরা চাকরীতে ঢুকলে তাদের সম্মান বাড়ে, মেয়েদের কমে। তারপর শিখল বিয়ে হয়ে গেলে পুরুষদের আদর কমে যায়, কিন্তু মেয়েদের বেড়ে যায়।

ঐ শহরে মণির দুটি একটি পুরোন বন্ধুও ছিল। সেই মণির ছেলেবেলাকার অনেক বকুনি খাওয়া বন্ধু আলিভুলি, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য মণিকে কত না লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল। তাদের দু'জনার দুটি ভাইএর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল; এখন ওখানে তাদের স্বামীরা কাপড়ের ব্যবসা করে, আর তাদের গুটি দুত্তিন ছেলেমেয়ে মণিদের স্কুলের নীচের ক্লাশে পড়ে, সেই সূত্রে মণির সঙ্গে তাদের নতুন ক'রে পরিচয় হ'ল। মণির মনে পুরোন দিনের বন্ধুত্বের স্মৃতিগুলি যতটা উজ্জ্বল ছিল, পটপরিবর্ত্তনের ফলে তা'দের মনে কিন্তু ততটা ছিল না। সেই-জন্য মণির নামধাম শুনে তারা যখন মণিকে একটা শনিবার বিকেলে চায়ে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাল, মণি যতটা উৎসাহ নিয়ে রওনা হয়েছিল, ততটা নিয়ে ফেরে নি। সেকালে যখন আলি-ভুলিকে নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হ'ত, মাঝে মাঝে মণির পক্ষ অবলম্বন করতাম ব'লে এবারেও তাদের কথা মণি আমাকে অকপট চিত্তে প্রকাশ করল। উত্তরে আমি লিখ্‌লাম—

স্নেহের মণি,

বলিস্ কিরে! তোদের সেই আলিভুলি আজ পর্যন্ত সুস্থদেহে বর্তমান আছে শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। তোদের বাড়ির লোকদের কাছে যেরকম সব রিপোর্ট পেতাম তা'তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে যদি কোনও ক্রমে বেঁচে বর্তেও থাকে তা' হ'লে জেলখানাতেই দিন কাটাবে! আর তারাই কিনা দিব্যি বাড়িঘর ক'রে, সংসার পেতে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরকন্না করছে! আশ্চর্য!

তোর অবস্থাটাও মন্দ নয়। সেজেগুজে গেলি পুরোন দিনের অনেক গল্প হ'বে আশা ক'রে, গিয়ে দেখলি সে আলিভুলি কোথায় গেছে তার জায়গায় হু'জন ফর্সা মোটা গিন্নী; একজনার নীল চোখ, একজনার হল্‌দে চোখ, কেবল মাত্র তাই দিয়ে চেনা যায়। তারা আবার তোর উপর দিব্যি বড় বড় চাল চেলে নিল, এ মা শেষটা মাষ্টারনী হলি, কতই বা মাইনে দেয়, বিয়ে হ'ল না বুঝি, বাবামা আর নেই, তা এক আধটা প্রাইভেট্ টিউশানি তারা যোগাড় ক'রে দিতে পারে, তাতে নিশ্চয় সুবিধে হবে; আহা বোর্ডিংএ বোর্ডিংএ কেমন ক'রে মানুষ থাকে, তারা হ'লে এক দিনেই মরে যেত, যখনই কিছু দরকার হ'বে তাদের বল্‌লেই ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আরে, মুখ্যু দুটো এত কথা বলে গেল, আর তুই চুপ ক'রে শুনে গেলি? তারপর এ-ও বল্‌ল যে ওদের স্বামীরা বাড়িতে থেকেও তোর সঙ্গে আলাপ করতে ভয় পেলে, কারণ মাষ্টার টাষ্টার দেখলে তাদের নাকি হৃৎকম্প হয়! আশা করি এবার হৃদয় থেকে আলিভুলির স্মৃতিটা উপড়ে ফেলে দিয়েছিস্?

দিদিমণি, স্বাধীনতা কি বিনা পয়সায় পাওয়া যায়? পৃথিবীর

সেরা সম্পদের মধ্যে স্বাধীনতাও একটি, তা'র জন্য কষ্ট করতে হয়। তোর ঐ গয়নাপরা আলিভুলি যদি তাদের মা'কেও একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে চায়, সেই পয়সাটি তাদের স্বামীদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়। এবং স্বামীদের যদি দয়া না হয়, আর কোনও উপায় থাকে না।

যদি তারা একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে চায়, তার অনুমতিটুকুও চেয়ে নিতে হয়। তার বদলে তারা যে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যটুকু পায়, তাই নিয়ে যদি একটু গর্বই করে, তাদের কি খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়? কতটুকুই বা লেখাপড়া শিখেছে ওরা, কত কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে, তুই যখন বন্ধুদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাচ্ছিস ওরা তখন ছেলেপুলে মানুষ করছে, কাজেই ওরা যে তোর স্বাধীনতার মূল্য বুঝ্‌তে পারবে না, এ আর আশ্চর্য কী? ভিতরে ভিতরে হয় ত' একটুখানি ক্ষোভও আছে, যে জীবনের কাছ থেকে যতটা পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পায় নি।

তবে তোকে ওরা হয় ত' কোনও দিনই ঠিক বুঝ্‌তে পারবে না, ঐ রকম কৃপার চক্ষেই দেখবে। বুঝ্‌তে পারছিস্ কী রকম বঞ্চিত ওরা? কি জিনিস পাচ্ছে না তাই জানে না। ঐ যে বলেছিলাম আমাদের দেশের লোকেরা এখনও স্বাধীন মেয়ে দেখে অভ্যস্ত হয় নি, এও তারই একটা ছায়া মাত্র।

তবুও দিদিমণি, আমার মনে হয় শতকরা পঁচানব্বই জন মেয়ের পক্ষে বিয়ে করাই স্বাভাবিক, এবং বাকি পাঁচজনকে কোনও মতেই বিয়ে করতে দেওয়া উচিত নয়। মনে হয় তুই ঐ পঁচানব্বই জনের একজন, কাজেই ঠাকু'মা আশা ক'রে আছে, যে সময় হ'লে দিদিমণিরও বিয়ে হ'বে। তার আগে একটু স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। ইতি।

ঐ যে শতকরা পাঁচ জনার বিয়ে হওয়া উচিত নয় লিখেছিলাম, মণির তা'তে খটকা লেগেছিল। তাদের বিষয়ে নানান্ প্রশ্ন ক'রে চিঠি লিখেছিল। আমি লিখ্‌লাম—

দিদি,

বিলেতে প্রায় সব মেয়েদেরই বিয়ে করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও, পাত্রের সংখ্যা বড় কম ব'লে অনেককে অবিবাহিতই থাক্‌তে হয়। আমাদের দেশে অবস্থাটা অত মন্দ না হওয়াতে প্রায় সকলেরই বিয়ে হ'য়ে যায়। কিন্তু ঐ বিয়ে-হওয়াদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দু' একজনা চোখে পড়ে, যাদের বিয়ে না হওয়া উচিত ছিল। স্বাস্থ্যের কারণে কতকগুলি, আর মানসিক কারণে বাকীগুলি।

বিয়ের উদ্দেশ্য একটি সংসার পাতা, এবং কয়েকটি শিশু মানুষ করা। যারা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, বা এত স্বার্থপর যে সংসারের জন্য কোনও পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়, বা পাঁচ-জনার সঙ্গে বাস করতে হ'লে যেটুকু বনিয়ে চল্‌তে হয়, সেটুকু করতে প্রস্তুত নয়, অথবা যারা ছোট ছেলে ভালোবাসে না, ও তাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে রাজী নয়, এ সব মানুষদের, তারা নারীই হোক্ বা পুরুষই হোক, কদাচ বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ তারা ভালো স্ত্রী বা স্বামী বা বাবা বা মা, কিছুই হ'তে পারে না। তবে মুস্কিল হচ্ছে তারা নিজেরা ছাড়া, অপর কারো পক্ষে এ সব কথা জানা অসম্ভব। যদি অতি অল্প বয়সে, নিজেদের জ্ঞানচক্ষু ফুটবার আগে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, তারা গোটা জীবনটা নিজেরাও অশান্তিতে কাটায় এবং পরেরও ঘোর অশান্তির কারণ হয়। কিন্তু তখন কোনও উপায় থাকে না।

তোমাদের ত' আর সে ভয় নেই, তোমরা যথেষ্ট বড় হয়েছ,

কাজেই ঐ রকম লোক দেখলেই তাকে বিয়ে করতে বারণ ক'রো। তবে তুমি আশা করি তাদের মধ্যে নও, কারণ ওরাই অস্বাভাবিক, বাকী পঁচানব্বই জনই স্বাভাবিক। ইতি।

ঠাকু'মা।

পাহাড়ের ঐ স্কুলে মণিমালার জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাট্‌ত, তা নয়। মাঝে মাঝে, সব সুখী মানুষের জীবনেও যেমন হয়, মণির সুখেও ছেদ পড়ত। মন খারাপ হ'লে আমাকে চিঠি লিখ্‌ত। সে সব চিঠির গোছা আমার কাছে তোলা রয়েছে, এখন খুল্‌লে হাসি পায়, কত তুচ্ছ দুঃখকে তখন মণির কত বড় ব'লে মনে হয়েছিল। গোলমাল হয়েছিল ক্লাস্ নাইনের একটি ছাত্রীকে নিয়ে। তার অতিশয় মন্দ আচরণের জন্য মণি তা'কে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। মেয়েটির পরিবারের ওখানে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা, তাঁরা মনে করলেন, এতে তাঁদেরও বুঝি অপমান করা হ'ল। হেডমিষ্ট্রেস্‌ও তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। আমার নাত্‌নীর হ'ল মুস্কিল। আমি তা'কে লিখ্‌লাম—

দিদিমণি,

যত বড় হ'বে, দেখ্‌বে এ দুনিয়াটা একটা আদর্শ সমাজ নয়। এখানে সব সময় ন্যায়ের জয় হয় না, কিন্তু তাই ব'লে ভঙ্গ দিয়ে চলে এলে চল্‌বে কেন? তুমি উচিত কাজই করেছিলে। তোমার ছাত্রী যদি উদ্ধত আচরণ করে, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার তোমার অধিকার আছে। এবং তাই নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে নিজের

পক্ষ অবলম্বন ক'রে লড়াই করাও তোমার কর্তব্য। তোমাদের হেডমিষ্ট্রেস্ বৈষয়িক মানুষ, সেইজন্য প্রকাশ্যে ঐ মেয়েটির পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করতে চান নি, হয়ত' এও মনে করতে পারেন অত বড় একটা পরিবারের অসন্তোষের কারণ হ'লে, স্কুলের অনিষ্ট হ'তে পারে। আমি তাঁকে আদৌ সমর্থন করছি না, দিদিমণি। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে তিনি যখন ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে বলেছেন যে তোমার আচরণে আসলে কোনও অন্যায় নেই, তবে নানান্ কারণে ইত্যাদি, তখন তোমার আস্‌বার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

দেখ, মণি, অন্যায়ের সঙ্গে যখনই যুদ্ধ করবে, জয়ী না হ'লে পালিয়ে যাবে, এটা কি কোনও কাজের কথা হ'ল? অন্যায় যখন প্রবল হয়, তখনই সে জয়ী হয়, এবং তখনই তার সঙ্গে লড়াই করবার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়।

তোমাদের স্কুলের এই ছোট অন্যায়টির একটা বিশাল ইঙ্গিত আছে। কারণ ঐ মেয়েটি যদি ঐ বাড়ির মেয়ে না হয়ে, কোনও সাধারণ গেরস্থ বাড়ির মেয়ে হ'ত, তা' হ'লে তাদের বাড়ির লোকেরাও এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না, এবং প্রতিবাদ করলেও, তুমি লিখেছ যে তোমার মনে হয় না যে হেডমিষ্ট্রেস্ তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করতেন। তোমাকেই ত' গাইতে শুনেছি—দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো, নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো। তবে যে বড় দুর্জনকে হেনে ফেলে নিজেকে অসহায় বোধ করছ। না, দিদিমণি, ঐখানে থেকেই নিজের হয়ে লড়াই কর। অভিমান ক'রে চুপ করে থেকো না; ঝগড়াও ক'রো না, কিন্তু নিজের পক্ষ নিয়ে, মুক্ত কণ্ঠে, নিজের যুক্তি, প্রকাশ করবে। মান অভিমান হ'ল গিয়ে স্বার্থের কথা; যেখানে

ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছ সেখানে স্বার্থের কথা ভুলে যেও। দেখবে এই খুদে সমস্যাটি সমস্যাই নয়, দুনিয়াতে সব জায়গায় এর অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। এবং সব সময় সব জায়গায় এর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। ইতি।

এই চিঠির ফলে মণিমালা রাগ ক'রে কাজ ছেড়ে চ'লে আসার সঙ্কল্প ত্যাগ করল। এলো সে বছরের শেষে যখন পাহাড়ে দারুণ শীত পড়েছে। তিন মাসের জন্য স্কুল বন্ধ, মণির লম্বা ছুটি। এই সময় একটি সুদর্শন যুবককে মণির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। মনে হ'ল নিরীহ প্রাণী, ভারী সৌখীন, ভারী কায়দা-দুরস্ত, এত ভদ্র তার ব্যবহার যে খোলাখুলি তাকে কিছু বলাই অসম্ভব। শোনা গেল কী সব পাশ-টাশ করেছে, দস্তুরমত শিক্ষিত তবে কাজকর্ম কিছু করে বলে মনে হ'ল না। বড়লোক মামার বাড়িতে থাকে, কোনও অভাব নেই, মনের মত কাজ না পেলে নাকি কাজ করবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। হাতে অশেষ সময়, মণির সঙ্গে পাহাড়ে আলাপ হয়েছিল, এখানে ফিরে এসেও সেই বন্ধুত্বটুকুই বেচারী হয় ত' রক্ষা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু মণির মা ভেবে চিন্তে অস্থির। ও লোকটাকে কেন বাড়িতে ঢুকতে দিলি রে মণি? লোকটা যে শুধু বন্ধু, মণির মা তা' কিছুতেই বুঝবেন না। অগত্যা দু'জনেই আমাকে চিঠি লিখল। আমি মণিকে লিখলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

ঐ যে গিরগিটির মত দেখতে, অতিশয় কায়দাদুরস্ত যুবকটি, ও যদি তোমার পাণিপ্রার্থী না হয় তা' হ'লে তোমার মা'র দুশ্চিন্তার

কোনও কারণ নেই। আর যদি তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে থাকে, তা' হ'লে দুটি মাত্র পন্থা আছে, তার মধ্যে একটা অবলম্বন করতেই হবে। যদি তুমিও সম্মত থাকো তা' হ'লে মাকে ব'লো রস্থনচৌকীর ব্যবস্থা করতে। আর যদি সম্মত না থাকো তা' হ'লে তা'কে পত্র-পাঠ বিদায় দিয়ে দাও। এ নিয়ে আবার একটা সমস্যা হ'তে পারে না কি ?

তবে যদি তোমার মত থাকে, আর গিরগিটির মত আছে কি নেই সেটা বোঝা না যায়, তা' হ'লে প্রথমেই তার মতটা জানা দরকার। এমন কি মত না থাক্‌লেও ত' কত সময়ে কত লোকের মত করিয়ে নেওয়া হয়েছে ব'লে শোনা গেছে। তাই বলে অবশ্য গলায় দড়ি বেঁধে ছাদ্‌নাতলায় টেনে আনাও উচিত নয়। বরং সর্বদা পালিয়ে যাবার পথ খোলা রাখ্‌লেই শুনেছি বিবাহ-বন্ধন সব চেয়ে সুখের হয় ও পালিয়ে যাবার ইচ্ছাটাও সব চেয়ে কমে যায়। তবে কিনা পাত্র হ'বার যোগ্যতা আছে কি গিরগিটির ? শুন্‌লাম রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, শেষটা অন্ধকারে গোরুটোরু দেখ্‌লে ভয় পাবে না ত' ? তা' হ'লে কিন্তু চল্‌বে না দিদিমণি, বরং এখুনি বিদায় করে দাও। চাক্‌রী-বাক্‌রী কাজকর্মও করে না শুন্‌লাম, তবে আর পাত্র হবার যোগ্যতা কোথায় ? বরং এখন বিদায় করে দাও, চাক্‌রী-বাক্‌রী হ'লে আরেকবার এসে চেষ্টা করতে ব'লো।

এত কথা বল্‌ছি বটে, কিন্তু আমার মনে হয় গিরগিটি বেচারা বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু আশাই করে না এবং তোমার মা'র এত আশঙ্কার কোনও ভিত্তিই নেই। তা' হ'লেই হ'ল মুস্কিল। বিলেতে ছেলে বন্ধুরা বান্ধবীদের এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায় দাওয়ায়, সিনেমা দেখায়, তার মানে মোটেই নয় যে বিবাহ করবার ইচ্ছাতেই ওরকম করে। আমাদের দেশে সে রীতি নেই। গতবার

যে বলেছিলাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়কার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য আছে, এ বিষয়ও তাই। সে সময়ে বিলেতেও মেয়েরা অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে একাকিনী বেরোত না। তা' হ'লে ভারী নিন্দা হ'ত। এ ত' তোমার জানাই আছে। একটু সিনেমা দেখ্‌তে যাবার জন্য কি আর অত অশান্তি করতে হয়? গিরগিটির মনে মিছিমিছি কষ্টও দিও না, আবার বৃথা আশাও আরোপ ক'রো না, আরও দুচার জনা বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে সবাই মিলে গল্পটল্প ক'রো, দল বেঁধে বেড়াতে যেও, মার আর কোনও ভয় থাক্‌বে না। আর গিরগিটি যদি ওরকম বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট না থাকে, সে নিজেই খসে পড়বে। মা'কেও কেন ডাকো না, ও এলে? দেখ দিদিমণি, আমি বল্‌তে চাই যে ব্যাপারটা এমন ক'রে সাম্‌লে নাও যা'তে কারো ভুল বোঝার সুযোগ না থাকে, পাত্রেরও না, আবার দর্শকদেরও না।

আবার যদি ওর বন্ধুত্বের কোনও মূল্য থাকে তা'কে অমনি অমনি ত্যাগ ক'রো না; দুনিয়ার সেরা জিনিসের মধ্যে স্বাধীনতা যেমন একটি, বন্ধুত্বও সেইরকম আরেকটি। যে বন্ধুত্বের অপমান করে সে অতিশয় অভাজন। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

যাই হোক্ এই সমস্যাটাও সহসা আপনা থেকেই ভঞ্জন হয়ে গেল। ঐ যুবকটির, তা'র আসল নাম শুন্‌লাম কনক, মামা তাঁর বন্ধু-কন্যার সঙ্গে কনকের বিয়ে ঠিক করে ফেল্‌লেন। কনক একদিন সলজ্জভাবে সে কথা এসে জানাল, মণিমালার শুভ-কামনা প্রার্থনা

করল। মণি ত' খুব খুসি, ওর মা তার চেয়েও বেশী। বেশ বাবা বেশ, বিয়ের পর বৌ নিয়ে এসো, আমাদের পর মনে ক'রো না, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়েরই সমান। এই ধরণের কত কী বল্‌লেন। বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল বৈ-কি, তবে এরা কেউ যায় নি, একেবারে অপরিচিত স্থান। বিয়ের পর কনককে সস্ত্রীক একদিন চা খেতে বলা হ'ল। সেদিনই মণিমালা লক্ষ্য করল পুরোন সমস্যাটা ভঞ্জন হ'ল বটে, কিন্তু তার বদলে আবার একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কনকের বৌ যেন মণিকে, সত্যি কথা বল্‌তে কি, শুধু মণিকে নয়, কনকের অবিবাহিত জীবনের যাবতীয় বন্ধু ও বান্ধবী-দের, সংখ্যায় তারা খুব কমও নয়, সকলকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। মণির খুব মজা লেগেছিল, আমাকে লিখেছিল। আমি লিখ্‌লাম "এটা খুবই স্বাভাবিক, দিদিমণি। শুধু আমাদের দেশে কেন, দুনিয়ার সর্বত্র স্ত্রীরা ও বান্ধবীরা, অর্থাৎ বিবাহের আগেকার বান্ধবীরা পরস্পরকে পছন্দ করে না। বিবাহের পর যেসব নতুন বান্ধবী হয় তাদের বরং ক্ষমা করা যায়, কারণ সেসব বান্ধবীরা ত' আর স্বামীর বান্ধবী নয়, স্ত্রীরও তাদের মধ্যে অংশ থাকে, কিন্তু বিয়ের আগেকার বান্ধবীরা সর্বদা সন্দেহের পাত্রী হয়ে থাকে। এর মধ্যে স্বামীর একটু প্রচ্ছন্ন প্রশংসাও আছে। কারণ ঐ সন্দেহটার কারণ হ'ল স্ত্রীরা ভাবতেই পারে না যে তাদের স্বামীরত্নদের সঙ্গে পরিচিত হয়েও কোনও নারী অবিচলিত ও নিষ্কাম থাক্‌তে পারে! এইজন্যই অনেক সময় স্বামীরা এতে কিছু মনেই করে না, বরং বহু পুরোন বন্ধুত্বকে এই ভাবে ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়। তা' ছাড়া সত্যি কথা বল্‌তে কি, গিন্নীকে খুসি করবার জন্য সর্বদাই দু'চার জনা বান্ধবীকে ভুলে যাওয়া চলে। এতে কারো রাগ করবার কিছু নেই। কাজেই তুমিও এখন কনকের বন্ধুত্ব ছাড়াই

জীবন কাটাবার জন্য প্রস্তুত হও। নয় ত' কনকের বৌএর বন্ধু হ'য়ে যাও। কেবলমাত্র তা' হ'লেই বন্ধুত্বটা টিক্‌বে।”

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মণিমালার ছুটির তিনমাস ফুরিয়ে গেল। মণিমালার মার ভারী আপত্তি সে আবার চাক্‌রিতে ফিরে যায়, বেশীদিন চাক্‌রি-বাক্‌রি করলে নাকি মেয়েদের বিয়ে হয় না, বেশী-দিন স্কুলমাষ্টারি করলে মেয়েদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, ইত্যাদি। মণি অবিশ্যি কোনও কথাই শোনে নি, আবার যখন মার্চ মাসের গোড়াতে স্কুলের দল রওনা হ'ল, মণিও তাদের সঙ্গে গেল। সেখানে গুছিয়ে বসে আমাকে চিঠি লিখেছিল, আমিও উত্তরে লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

বলেছি ত' দিদিমণি, বিদ্যাদান করার সমান মহৎ কাজ হ'ল কেবলমাত্র স্বাস্থ্যদান। বিদ্যাদান করে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবার অথবা নারীসুলভ কোমলতাগুলো হারাবার আশঙ্কা কেন থাক্‌বে বুঝতে পারলাম না। বরং আমার ত' মনে হয় যাঁরা একই হাতে রান্না করেন, ছেলে ঠ্যাঙ্গান ও পতিসেবা করেন, তাঁদেরই মেজাজ মর্জি খারাপ হয়ে যাবার বেশী ভয় আছে। তোমার নিজের কি মনে ভাবনা হয়, মণি? আমি বহু লোক দেখেছি আজীবন মাষ্টারি ক'রে ক'রে যেন তাঁদের স্বভাব ও ব্যবহার আরও মধুর ও কোমল হয়ে গেছে। মেয়েদের বেলায়ই বা তা' হবে না কেন? হাজার হোক্‌ শিশু প্রতিপালন হ'ল মেয়েদের কাজ, তারা মায়ের জাত। সেই কাজ করলে মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যাবে, এ ত' কোন যুক্তির কথা

হ'ল না। তবে যারা শিক্ষাদান করতে ভালোবাসে না, বাধ্য হয়ে করছে, তাদের অমন হওয়াটা আশ্চর্য নয়, মনের অসন্তোষটা বাইরের আচরণে ফুটে ওঠে। কিন্তু তুমি ত' ইচ্ছা ক'রে ও কাজ বেছে নিয়েছ, তোমার কী ভাবনা? শিক্ষাদান অনিচ্ছুক লোকের দ্বারা হয় না, একথা সত্যি। যেটা একটা আনন্দের ব্যাপার সেটা হ'য়ে ওঠে শাস্তির মত।

তারপর নারীসুলভ কোমলতার কথা যে লিখেছ, স্বাধীন জীবন যাপন করলেই যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, পরনির্ভরশীলতাই যদি তার একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকে, তা হ'লে দুর্বল স্বাস্থ্যের মতই সে বর্জনীয়। দুর্বলতা আর কোমলতা, দুটি ভিন্ন জিনিস, ভুলে যেও না। নারী হ'ল শক্তির আধার, তার মধ্যে দুর্বলতা থাক্‌বে কেন? কিন্তু কোমলতা থাক্‌বে বই কি, সহ্য করবার ক্ষমতা থাক্‌বে, ক্ষমা করবার শক্তি থাক্‌বে। সহানুভূতি করবার প্রসারতা থাক্‌বে। এগুলি সবলের ও স্বাধীনের গুণ, দুর্বলের নয়। ইতি।

ঐ বছরের মাঝামাঝি মণির চিঠিপত্রগুলো যেন তেমন নিয়ম ক'রে আসা বন্ধ হ'ল। আমারও একটু ভাবনা হ'ল, আর ওর মার কথা ত' ছেড়েই দিলাম। একেবারে যে লিখ্‌ত না তা নয়, তবে আগের মত যেন প্রাণ খুলে লিখ্‌ত না, একটু যেন সাবধান ভাব। আমি ওকে লিখ্‌লাম—

স্নেহের মণিমালা,

যেদিন তুমি জন্মেছিলে, তোমার দিদিমার বাড়ি গিয়ে, সকলের বারণ অগ্রাহ্য ক'রে আঁতুড়ঘরে ঢুকে, তোমাকে কোলে নিয়েছিলাম।

আমার বৌমার প্রথমে ছেলে না হয়ে মেয়ে হ'ল ব'লে সকলেই ভেবেছিল আমার বুঝি দুঃখ হয়েছে। মোটেই তা হয় নি, দারুণ গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। আমি তোমাকে কোলে নিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এর জন্য সাবধান সতর্ক শঙ্কাপূর্ণ এর মা-বাবা হোক্, আমি যেন চিরদিন এর বন্ধু হ'তে পারি। আজ পুরোন বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে বল্‌ছি দিদিমণি, অকপটচিত্তে আমাকে সব কথা খুলে বল। নইলে আমার দুঃখ হ'বে। ইতি।

ঐ যে আমার নাত্‌নী মণিমালার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের কথা বল্‌ছিলাম, বাইরের লোকের কাছে হয় ত' এমন কিছুই ধরা পড়ত না, কিন্তু মণির মার আর মণির ঠাকুরমার কানে একটা নতুন সুর বাজতে লাগল। মনে হ'তে লাগ্‌ল আমাদের প্রগল্‌ভা মণিমালা যেন আগেকার মত ঝেড়েঝুড়ে মনের কথা সব লিখ্‌ছে না, যেন সাবধান হ'য়ে কথা বল্‌ছে, সবটা যা'তে প্রকাশ না হয়ে যায় এ বিষয়ে যেন ভারী সতর্ক। মণির মার দুঃখ হ'ল, অভিমান হ'ল, আমার দুঃখ অভিমানের বয়স চলে গেছে, আমি ছাড়ব কেন? খোলাখুলি কারণ জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম, সে কথাও গতবার বলেছিলাম। মণির উত্তরের মধ্যে চিন্তার খোরাক পেলাম। এবার মণির জীবনে সত্যিই একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে তাকে যে চিঠিখানি লিখ্‌লাম তা থেকেই আপনারা পরিস্থিতি অনুমান ক'রে নিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, আমি এই ধরণের একটা কিছু মনে করেছিলাম এবং ছোট বেলা থেকে মণি যদি সকল বিষয়ে আমার সঙ্গে অকপটভাবে আলোচনা না করত, এখনও সব কথা খুলে লিখ্‌ত কিনা সন্দেহ।

স্নেহের দিদিমণি,

তুমি ত' জান আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে কোনও সমস্যাই উপস্থিত হয়নি, যার একটা না একটা নিষ্পত্তি না হ'য়ে গেছে। তোমারটারও নিশ্চয় হ'বে। ছোটবেলায় তোমাকে যখন রূপকথা শোনাতাম, মনে নেই সেই সব রাজকুমারীদের কথা, যারা হয় গরীবের ছেলেকে নয় ত' শত্রুর ছেলেকে ভালোবাস্‌ত? এও নিশ্চয় মনে আছে যে তারা সকলেই অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, অনেক ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়ে, তবে শেষ পর্যন্ত যাকে ভালোবাস্‌ত তাকেই বিয়ে করত? যে জিনিস কামনার যোগ্য তার জন্য দুঃখও সওয়া যায়। তার জন্য ত্যাগ স্বীকারও করা যায়। ছোট-বেলা থেকে তোমাকে অনেকবার লিখেছি যে বড় জিনিসের জন্য ছোট জিনিসকে ছেড়ে দিতে হয়। এ বিষয়েও ঠিক তাই। দুনিয়াতে সব কিছু পাবে এমন আশা ক'রো না, কিছুটা নেবে, আবার তার জন্য কিছুটা ছেড়ে দেবে, এর জন্য মনকে প্রস্তুত কর। সহজ-লব্ধ সুখের দাম অনেক কম। আর সুখই জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তুও নয়।

তোমার চিঠি পড়ে যতদূর বুঝলাম, তুমি এতদিন পরে এমন একটি মানুষের দেখা পেয়েছ যে তোমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিন্তু তোমার মনে হয় এ বিবাহে তোমার বাবা মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রবল আপত্তি হবে। তুমি আমার বুদ্ধিমতী দিদিমণি, আপত্তির কারণও খুলে বলেছ। যথা, পাত্রের বাপ সিনেমা জগতে নাম করেছেন এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানান্ কাহিনী প্রচলিত আছে। পাত্র স্বয়ং সুস্থ, শিক্ষিত ও তরুণবয়স্ক এবং সেও সিনেমা পরিচালক, তবে তার সম্বন্ধে কোনও গল্প শোনা যায় নি। মূল কথা, তোমার তাকে ভালো লেগেছে, বাইরে থেকে দেখেও ভালো লেগেছে, মিলে-মিশেও ভালো লেগেছে। কিন্তু এই ভালো লাগাটাকে প্রশ্রয় দিতে

তোমার ভয় হ'চ্ছে, কারণ তোমার বাড়ির লোকেরা সিনেমা থিয়েটারকে পাপের আধার ব'লে জ্ঞান করে।

আমি বলি তুমি তোমার বাবা-মাকে খুলে বল। তুমি যখন বল্‌ছ যে ছেলেটিকে ও তার বাপকে তাঁরা চেনেন, তখন আর সে বিষয় তাঁদের তদন্তের প্রয়োজন হবে না, কাজেই তাঁদের মতটা অবিলম্বেই শুন্‌তে পাবে। গোড়া থেকে মনগড়া আশঙ্কা নিয়ে ভয় পেও না দিদিমণি, বাবা মাকেও একটা চান্স দিও। তোমার ঠাকু'মার একমাত্র প্রার্থনা তুমি সুখী হও, তোমার জীবন সফল হোক্। ইতি।

ঠাকু'মা।

এইখানেই ব্যাপারটা চুকে গেল না। মণি তার বাড়ির লোকদের ভালো করেই চিন্‌ত। তাদের বিষম আপত্তি হ'ল। তারা তাকে বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিল, অবাধ্য সন্তানের কী পরিণাম হয় সেও বল্‌ল, পাপের মোহের কথাও বল্‌ল, আরও মেলা কথা বল্‌ল। আমি লিখলাম—

স্নেহের মণিমালা,

সকলের মত ত' শুন্‌লে, এবার আমার মতটাও শোন। তোমার যেদিন একুশ বছর বয়স হ'ল সেদিন থেকে তুমি সন্তান পদের শিকল কেটে বড় হ'য়ে গেলে, আর তোমার বাবা-মার কথামত চলবার কোনও বাধ্যবাধকতা রইল না। কেবল মাত্র স্নেহের বন্ধন-টুকু রইল। অতএব তাঁরাও যখন ভ্রমশীল মানুষ মাত্র, তাঁদের বিচার-বুদ্ধিও নির্ভুল নয়।

তাঁরা অবশ্যই তোমার মঙ্গল ব্যতীত আর কিছু চান না, কাজেই এবার ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে নিজের বিবেক, সদ্‌বুদ্ধি ও হৃদয়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নাও ত'। তারপর তোমার কর্তব্য তুমি নিজে স্থির কর, কারো কথায় বিচলিত হয়ো না, বাবা-মাকে অযথা দুঃখ দিও না, কিন্তু তোমার জীবনের দুঃখ সুখ সফলতা বিফলতার জন্য তুমি ভগবানের কাছে দায়ী, তাঁদের কাছে নও।

আর আমি? তোমার প্রথম কর্তব্য তোমার নিজের প্রতি, তারপর বাবা মার প্রতি; আমার সঙ্গে তোমার কর্তব্যের সম্বন্ধ নেই, আছে শুধু ভালোবাসার বন্ধন। আমি ভেবে দেখেছি তোমার ঐ পাত্রটি আমার যে তিনটি নিয়ম আছে বলেছিলাম, তার মধ্যে পড়ে যায়, অর্থাৎ সে সুস্থ, সচ্চরিত্র ও সচ্ছল। কাজেই আমার আবার আপত্তির কী কারণ থাক্‌তে পারে? ঝোঁকের মাথায় কিন্তু কিছু ক'রো না দিদিমণি, আগাগোড়া উভয় পক্ষের কথা ভেবে দেখো, তারপর মন ঠিক ক'রো। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

মাঝে মাঝে সংসারে এমন এক একটা সময় আসে যখন হঠাৎ যেন পরিবারের সমস্ত সুখ ও শান্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মণিমালাদের বাড়িতেও তাই হ'ল। মণিমালার হৃদয়ের আন্তরিক বাসনার কথা জেনেও, আমার হাজার বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও, তারা তাদের মতের কোনও পরিবর্তন করল না। তবু মণি দূরে ছিল তাই সব আলোচনা, সব মন্তব্য তার কানে পৌঁছে তাকে পীড়া দিই নি, তবে চিঠিপত্রে তাদের মতামতটা তা'র অজানা রইল না। একদিক দিয়ে ভালোই হ'ল নিজের মনটাকে পরীক্ষা ক'রে নেবার সে একটা

ভালো সুযোগ পেল। তার মন কিন্তু অটল রইল। ছেলেটি পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। বেশ ছেলেটি, বয়স বছর সাতাশ আটাশ হ'বে, দুএক বছর বেশীও হ'তে পারে। একেবারে কন্দর্পটি না হ'লেও খাসা চেহারাখানি, সুন্দর কথাবার্তা, ভালোই লাগ্‌ল। তারপর আমার নাত্‌নীকে চিঠি লিখেছিলাম।

স্নেহের দিদিমণি,

আমাদের শোভনকে আমার যে ভালোই লাগ্‌বে সে কথা তুমি খুব ভালো করেই জান্‌তে, নইলে কি আর অমনি অমনি শিখিয়ে পড়িয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে? কালো কুচ্ছিৎ হ'লে তা'কে নিশ্চয়ই ডানার তলায় ক'রে তুমি নিজেই নিয়ে আস্‌তে, তার কালো চেহারার নীচে তার সুবর্ণময় মনখানির পরিচয় নিজের মুখেই দিতে। যাই হোক্ সে বেশ ভালোই দেখ্‌তে। কিন্তু সেও যথেষ্ট নয়। ভালো চেহারা চোখে দেখ্‌তে ভালো লাগে বটে, কিন্তু যার সঙ্গে আজীবন বাস করতে হ'বে তার চেহারার কথা কিছুদিন পরে আর মনেই হয় না, বরং তার স্বভাব চরিত্র ও ধরণ-ধারণগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার।

তুমি যদি বাড়ির লোকের অমতে বিয়ে কর, তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য বা সহায়তা আশা করতে পার না। তারা যদি তোমার জন্য কিছু করে, সে তোমার বহু ভাগ্য, তোমার সাংসারিক জীবনের সমস্ত দায় তোমাকে এক্‌লা বইতে হ'বে। পেছুপাও হ'লে চল্‌বে না। ঝগ্‌ড়াঝাটি বা মতভেদ মনোমালিন্য হ'লে, মোটেই আর পাঁচজনা স্নেহশীল মানুষ এসে জোড়াতালি দিয়ে মিটমাট করিয়ে দেবে না। আমার তিনটি উপকরণ ত' আমি বলেই দিয়েছি, ওগুলি

থাক্‌লে আর আমার অমত নেই, কিন্তু তোমার আরও অনেক কথা বিবেচনা করা চাই। যেমন, তোমাদের দু'জনের ব্যক্তিগত রুচির একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। তার মানে অবশ্য নয় যে দুজনার পছন্দ অপছন্দগুলো অবিকল এক হওয়া দরকার। সে হ'লে ত' সংসার ভীষণ একঘেঁয়ে হ'য়ে যাবে। পর্দাগুলো লাল হবে, না নীল হ'বে, তাই নিয়ে বরং একটু তর্কাতর্কি হওয়া ভালো, হাওয়াটা হাল্কা হয়ে যাবে, আর ঘর সাজানোতে দু'জনেরই যে উৎসাহ আছে তাও প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু আলাদা রুচি হ'লেও, তাদের মধ্যে বিরোধটা যেন বেশী না হয়, একটার সঙ্গে অন্যটা যেন খাপ খাওয়ানো যায়। নইলে ছোট জিনিস থেকে আরম্ভ ক'রে, সংসার যে কী বিষময় হ'য়ে ওঠে সে আর কী বল্‌ব। ইয়োরোপে আমেরিকাতে কোথাও কোথাও কেবলমাত্র মনের অমিল হয়েছে ব'লে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে দেখা গেছে।

কী বল্‌তে চেষ্টা করছি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারছ? দু'জনার যে সব পছন্দের অমিল হয় সেগুলি খুব তুচ্ছ হ'লে কিছু এসে যায় না, কিন্তু অমিলের কারণ যদি গভীর হয়, দু'জনার চরিত্রের মূলে যদি সেই কারণ থাকে, তা' হ'লে পরিস্থিতিটি বেশ গুরুতর হ'য়ে উঠতে পারে। যথা, তুমি যদি আমোদপ্রমোদ ভালোবাস কিন্তু আমোদপ্রমোদকে সে যদি অন্যায় মনে করে তা' হ'লে মুস্কিল। একজন যদি গানবাজনার চর্চা করতে চায় আর অপরজন তা'তে তিতো বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, তবেই বা কেমন করে চল্‌বে? একজন যদি লোকজন খাওয়াতে ভালোবাসে, ঘর সাজাতে ভালোবাসে, অন্যজন হাড়কিপ্টে হয় তা' হ'লে ত' হবে না। একজন যদি সাদাসিধা সরল প্রাণী হয়, অন্যজনের হিংসুটে সন্দেহপরায়ণ স্বভাব হয়, তা' হ'লেও হবে না। অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাচ্ছি যে

পরস্পরকে এখনই পরখ করে নাও, পরে আর সময় পাবে না। বিয়ে-ভাঙ্গা-আইন পাশ হয়ে গেলেও, অত সহজে বিয়ে ভাঙ্গা যাবে না, কাজেই সাবধান। ইতি।

সুখের বিষয় শোভনের বাবা মণিমালার কথা শুনে খুব খুসি হয়েছিলেন। আমাকে একদিন দেখতে এলেন, কী করা যায় পরামর্শ করতে এলেন। বল্‌লাম কিছুদিনের জন্য কালের স্রোতে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিতে। পরে মণিকে লিখলাম।

স্নেহের মণি,
শোভনের বাবা এসেছিলেন, আমাদের পুকুরধারে পেয়ারা গাছের তলায় বসে মেলা গল্প করলেন, চা আর নিম্‌কি খেলেন। অতিশয় কায়দাদুরস্ত, দেখতেও অতিশয় সুপুরুষ। কিন্তু মনে হ'ল সহজ মানুষ, এঁর সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হবে না, কারণ অপরের দোষ দুর্বলতা উনি অতি সহজেই মার্জনা করবেন। কিন্তু এর দুটো দিক্ আছে; ওঁর দুর্বলতাগুলোকেও তোমাকে সেই-রকম সহজেই ক্ষমা করতে হ'বে, নইলে স্নেহের সম্বন্ধ টিক্‌বে না।

দেখ দিদিমণি, আমি ধরে নিয়েছি যে তোমার বাবা-মার মত হোক্ বা না হোক্, তোমাদের বিয়ে হ'বেই। মন খারাপ ক'রো না দিদিমণি, গয়না-গাঁটি সাজসজ্জা, বরাভরণ, লোক নিমন্ত্রণ করা, ওসব আসলে কিছুই নয়। আসল কথা হ'ল তোমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা কর কি না, ভালোবাসো কি না এবং একটা পরিবার সৃষ্টি ক'রে, তার পালনের জন্য নিজেদের নিবেদন করতে প্রস্তুত আছ কি না। কারণ কেবলমাত্র দুটি মানুষকে দিয়ে

বিবাহ হয় না। তাদের ভবিষ্যৎ ছেলেপুলেদের কথাও ভাবতে হয়, আত্মীয়-স্বজনদের কথাও ভাবতে হয়। বাপমা বিয়ে ঠিক করে দিলে যা ভাববার তাঁরাই ভাবেন, ছোট মেয়ে শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয়, তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে সে পারিবারিক জীবনে বিলীন ক'রে দেয়। কিন্তু তুমি খুব ছোট মেয়েটিও নয়, তোমার ব্যক্তিগত মতামতগুলি স্বাধীনভাবে বাস করার ফলে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো হ'য়ে যেতে দিও না, পাঁচ-জনের সঙ্গে যেন মিলেমিশে থাক্‌তে পার। সব জিনিস তোমার মনের মত নাই বা হ'ল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিবেকে বাধছে, আরেকজনের স্নুখের জন্য নিজের মতটা না হয় ছেড়েই দিলে। কিন্তু কখনও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিও না। তা' হ'লে যেটা ছিল উদারতা সেটা হয়ে যাবে দুর্বলতা। অধর্মের সামনে কখনও দুর্বল হবে না। কিন্তু তাই ব'লে পরের ধর্মেও নাক ঢুকিও না। তুমি যাকে অধার্মিক মনে করছ, তারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আছে। দরকার বোধ করলে তাকে দুটো সৎপরামর্শ দিও, তার বেশী যদি তোমার অধিকার না থাকে ত' এগিও না। শোভনের বাবাটিকে দেখে এত কথা আমার মনে হয়েছে।

শুন্‌লাম তোমরা আলাদা থাক্‌বে। সে খুব ভালো, নিজেদের আদর্শে নিজেদের সংসার গড়বে। আবার শুন্‌লাম শোভনের মা নেই। পিসিমা ভাইএর সংসারের কর্ত্রী। তিনিও বুড়ো হয়েছেন। দিদিমণি, কোন্ দিকে কখন তোমার কর্তব্য সে খেয়াল রেখো।

আরেকটা কথা ভুলেই যাচ্ছিলাম। বাবামার মত না থাক্‌লে, বুড়ো ঠাকু'মার বাড়িতেই না হয় বিয়ে হবে। পেয়ারাতলায় নহবৎ বস্‌বে, কেমন? তোমার দাদু সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কিন্তু দিদিমণির বিয়েতে তাঁর মত আছে। ইতি।

সেই বছর শীতকালে আমার নাত্‌নী মণিমালার বিয়ে হ'ল। তখন আমার বাগানে শীতকালের ফুল ফুট্‌তে সুরু করেছে। মণি পাহাড় থেকে যেদিন নাম্‌ল ওর দাদু গিয়ে ওকে সোজা আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওর মা-বাবার বিয়েতে মত নেই। তাই নিয়ে আমাদের সঙ্গেও তাদের খানিকটা মনকষাকষি চল্‌ছে। মণি পাহাড়ে থাক্‌তেই সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, নেমে আসবার কিছুদিন আগে আমি ওকে লিখেছিলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

কে যে তোমাকে বলেছে যে বাপমায়ের অমতে বিয়ে করলে সে বিবাহ সুখের হয় না, সে আমি টের পেয়েছি। নিশ্চয়ই তোমার বড় মাসিমা। দেখ মণি, এ দুনিয়াতে মানুষের মত বা অমতের কতটুকুই বা মূল্য? মানুষের যতটুকু বুদ্ধি ঠিক ততটুকু ত'? তোমার বাবামার অমতের কারণ যখন তুমি তলিয়ে বুঝে দেখেছ, এবং অনেক ভেবেচিন্তেও যখন তাঁদের যুক্তি গ্রহণ করতে পার নি, তখন আর তাই নিয়ে মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না।

আমি ত' তোমাকে আগেই বলেছি যে নিজের মন স্থির করে কাজ করবার, এবং তার ফলে যে দুঃখসুখের ভার নেবার প্রয়োজন হ'বে, সে সব বহন করবার তোমার বয়সও হয়েছে, শক্তিও আছে। আর কখনও অপর কারো উপরে নির্ভর করতে চেষ্টা ক'রো না। এ বিবাহে তোমরা সুখী হবে, আশীর্বাদ করি। যদি সুখী হও তার জন্য যেমন অপর কারো কাছে ঋণী থাক্‌বে না, যদি কখনও দুঃখ বহন করতে হয়, তার জন্যও অপর কা'কেও দোষ দিতে পাবে না।

কাজেই এই বিবাহকে সফল করবার জন্য সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করবে। সেকালে ছোট মেয়েদের বিয়ে হ'ত, তারা শ্বশুরবাড়িতেই ঘরকন্নার শিক্ষা পেত, তাঁদের সংসারের উপযুক্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। বাবা-মা ভেবেচিন্তে তাঁদের সাধ্যমত সাজিয়ে গুছিয়ে মেয়েকে যৌতুক দিয়ে, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেন। তবু তাঁদের কর্তব্য ফুরিয়ে যেত না, তত্ত্ব পাঠাতে হ'ত, নাতিনাত্‌নীর সব তাঁদের কাছে এসে জন্মগ্রহণ করত; আজীবন মেয়ে বাপের বাড়ির ওপর ও নাতিনাত্‌নীরা মামাবাড়ির ওপর একটা দাবী রক্ষা করত।

তুমি মা-বাবার অমতে বিবাহ করছ, সে দাবী তোমাকে ছেড়ে দিতে হ'বে। ঐ আমাকে দিল না, আমাকে ডাক্‌ল না, আমার কাছে এল না এ কথা কখনও বল্‌তে পাবে না। মনে রেখো তোমার মত রক্ষা করবার তোমার যত অধিকার আছে, তাঁদের মত রক্ষা করবার তাঁদেরও ঠিক ততটাই আছে।

তারপর দিদিমণি, দেখবে আরও শত শত ছোট সমস্যা এসে উপস্থিত হবে। যতদূর বুঝলাম তোমার ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তোমার বাপের বাড়ির উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছেন। কারণ তাঁদের বিবাহে অমত করার পিছনে এঁদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যদি মাঝে মাঝে তোমার বাপের বাড়ি সম্বন্ধে সমালোচনা করেন, অথবা নিন্দা করেন, তখন তুমি কী করবে বল ত'? দিদিমণি, একথা কদাচ ভুলো না যে এখন যদিও তোমার বাবা মা তোমাকে সমর্থন করেন নি, তবুও যে মুহূর্তে তুমি জন্মালে সেই মুহূর্ত থেকে, তোমার মঙ্গল চিন্তা ছাড়া, তাঁরা আর কিছু করেন নি। তোমার জন্য, তোমার অলক্ষ্যে, কত শতবার তাঁরা যে নিজেদের সুখসুবিধাগুলো অকাতরে ত্যাগ করেছেন, তার হিসাব কেউ রাখে না। এরই জন্য তাঁরা তোমার

বিরুদ্ধাচরণে এত ব্যথা পান। তাঁদের আমি সমর্থন করছি না; তাঁরা বিষম ভুল করছেন, নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ সন্তানের জীবনে আরোপ করবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু তাই বলে তুমি যদি তাঁদের সেই পুরোন স্নেহের কথা ভুলে গিয়ে, তাঁদের নিন্দা-বাদীদের পক্ষ নাও, তা' হ'লে আর আমি দুঃখ রাখবার জায়গা পাব না। নিন্দাও ক'রো না, ঝগড়াও ক'রো না ; তাঁদের স্পষ্ট ক'রে বলে দিও যে তোমার সাম্‌নে তোমার মা-বাবার অপ্রিয় সমালোচনা করলে তোমার কষ্ট হয়।

মেয়েদের যখন বিয়ে হয়, বিশেষ ক'রে বয়স্ক মেয়েদের, তাদের মস্ত একটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একটা পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যক্তিগত রুচিকে অপর একটা পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা রুচি ও দৃষ্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কিন্তু তাই যদি না পারলে তবে আর কী শিক্ষা পেলে এত দিন ? ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

তারপর আরও অনেক চিঠি লিখেছিলাম কারণ আমার বি-টি পাশ করা, বাইশ বছরের নাত্‌নী, প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে কেমন যেন কূল পাচ্ছিল না। তবে একটা বিষয়ে তার মন অবিচলিত ছিল, একবার যখন সে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিল আর তা'র সে বিষয়ে কোনও দ্বিধা ছিল না। তবে কিনা চিরকাল যে স্নেহশীল প্রিয়জন দিয়ে পরিবেষ্টিত থেকেছে, তার পক্ষে একাকী দাঁড়ানো বড় শক্ত। আমি ওকে লিখ্‌লাম—

দিদিমণি,

পৃথিবীতে মানুষ একা আসে একা যায়, শেষ পর্যন্ত কেউ

কারো জন্য কিছুই করতে পারে না। তুমি মঙ্গল ইচ্ছা নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ কর, তার পরিশেষে মঙ্গল হবারই সম্ভাবনা বেশী। নিজের জন্য বেশী দুঃখ করতে যেও না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, দুঃখ করবার এমন আর কী হয়েছে? তোমার বাবা-মা সুস্থ আছেন, তুমি মনের মত স্বামী পাচ্ছ, তাঁরাও সকলে ভালো আছেন, এত সুখই বা ক'জনা পায়?

নিজের জন্য দুঃখ না ক'রে, কেমন ভাবে নতুন জীবন সুরু করবে এখন সেই চিন্তা কর।

মনে রেখো যে যদিও তোমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমার স্বামীর প্রতি, তবুও তার আত্মীয়স্বজনকেও তোমার নিজের আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে হ'বে। যাদের সঙ্গে একত্র মানুষ হওয়া যায়, তাদের দোষগুণগুলি এত পরিচিত হয়ে যায় যে তাদের ভুলচুক আমরা অভ্যাসবশতঃই অনেক সময় ক্ষমা করে দিই। সেইজন্য নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হওয়া অনেক বেশী সহজ। কিন্তু পরিণত বয়সে যাদের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় হয়, তাদের দোষত্রুটিগুলো ত' আর সহানুভূতিশীল শিশুর চোখ দিয়ে আমরা দেখি না, তাই তাদের ক্ষমা ক'রে স্নেহের সম্বন্ধ রচনা করা অনেক বেশী শক্ত কাজ। তবে যদি একথা মনে রাখো যে তুমিও নিখুঁৎ নও, আর তোমারও দোষ-দুর্বলতাগুলোকে মাপ ক'রে, তাদের পরিবারের বক্ষে তোমাকে তারা গ্রহণ করেছে, তা' হ'লে কাজটা একটু সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু তাই ব'লে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলো না। যে সব গুণের জন্য দুনিয়ার এত মেয়ের মধ্যে শোভনের তোমাকেই ভালো লেগেছে সেগুলিকে রক্ষা ক'রো।

আমাদের দেশের মেয়েদের বিষয়ে অনেক সময় একথা বলা

চলে যে তারা জলের মত ; যে পাত্রে ঢালো তারই আকার ধারণ করে। অনেকে এতদূরও বলেন যে এটা একটা মহৎ গুণ এবং এতে সংসারে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ পুরুষমানুষদের কথামতই সব হয়, কোনও গলদ্ থাকে না। কিন্তু সত্যি ক'রে মেয়েরা ত' আর প্রতিধ্বনি নয়, তাদের নিজেদেরও একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এবং সে ব্যক্তিত্বটা বেশ জোরালোই। কোন্ বিষয়েই বা মেয়েরা দুর্বল ? তা'রা সকাল সন্ধ্যে খাট্‌তে পারে, পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী শারীরিক ব্যথা যন্ত্রণা সইতে পারে, খাওয়া শোয়ার কষ্টও বেশী সইতে পারে, শুধু এক ভারী বোঝা তুলতে পারে না। তবে আর কি এমন দুর্বল হ'ল যার জন্য আজীবন তারা নাবালিকা হ'য়ে থাক্‌বে ? না, দিদিমণি, তোমাদের স্থান হ'ল স্বামীর পাশে, তার আড়ালে নয়। দু'জনে মিলে কাজ করবে এবং সর্বদা তোমাদের মিলিত জীবনে তোমার ব্যক্তিগত শক্তি নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বে। সে ভুল করলে, তুমি সেটা শুধ্‌রে দেবে। ইতি।

পাহাড়ের ঐ স্কুলের ইংরিজি টিচার অনিলা ঘোষের সঙ্গে মণিমালার ভারী ভাব ছিল। অনিলা মাঝে মাঝে মণিকে বল্‌ত—"তবে আর অত কষ্ট ক'রে বি-এ. বি-টি পড়্‌লি কেন ? ভালো করে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানটা পড়্‌লেই ত' চল্‌ত। বিয়ের পর যদি কোথাও কাজকর্ম না করিস্, চর্চার অভাবে সব ভুলে যাবি।" অনিলার কথা শুনে মণিরও ভারী দুঃখ হ'ত। আমি লিখ্‌লাম—

মণি,

যেটা শেখা যায় সেটাকে এমন ক'রে শিখ্‌তে হয় যে সেটা তোমার চিন্তাধারার অঙ্গ হ'য়ে যায়। দু'দিন ইস্কুলে না

পড়ালেই যদি তোমার বি-এ পাশের জ্ঞানগুলো সব লোপ পায় তা' হ'লে বলতে হবে তুমি সেগুলিকে বাইরে জড়িয়ে রেখেছ মাত্র, অন্তরে গ্রহণ করতে পার নি।

স্ত্রীর বা মা'র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমার আইবুড়ো অনিলা জানেই বা কী আর বোঝেই বা কতটুকু ? শুধু রাঁধাবাড়া ঘর গুছোনো ত' মাইনে করা চাকররাও ক'রে থাকে। ছেলেমেয়েদের শুধু অ-আ শেখানো ত' স্বচ্ছন্দে স্কুলে সম্পন্ন হয়। তবে আর স্ত্রী বা মা'র কাজ কী রইল ? তবে দিদিমণি, লেখাপড়া শেখা থেকে ঐ মানসিক লাভটুকু ছাড়াও আরও অনেক লাভও হয়। দিন দিন যেমন দাঁড়াচ্ছে, অনেক জায়গাতেই যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনে পয়সা রোজগার করে অনেক সুবিধা হয় সন্দেহ নেই। ইয়োরোপে এরকম হচ্ছেও। কিন্তু তাতে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য্য একটু কমে যাবার আশঙ্কা থাকে। সারাদিন আপিসে চাকুরী ক'রে সন্ধ্যেবেলা দু'জনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এসে, বাড়িঘরই বা সাজাবে কে, ছেলেমেয়েদেরই বা আদর করবে কে, আর প্রয়োজনের চেয়েও বড় যে সব নিষ্প্রয়োজন স্নেহের সেবা আছে সেই বা করবে কে ? সংসার তা' হ'লে শুধু একটা প্রয়োজনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, দিদিমণি, তুমি আমার কথা সমর্থন করবে কি না জানি না, আমি বলি দরকার না হ'লে চাকুরী ক'রো না কিন্তু মহিলাসমিতিতে বিনা পয়সায় দুঃখীদের লেখাপড়া শিখিও। এবং নিয়মিত পড়াশুনোর চর্চা রেখো, ভুলে যাবার ভয় থাকবে না। তার উপর চাকুরীর বাজারেরও যা টানাটানি; যাদের অতিশয় প্রয়োজন তারাই চাকুরী পায় না, তার উপর যাদের দরকার নেই তারা চাকুরী নিলে এদের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। সেই জন্য চাকুরীর জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠো না। ইতি।

মণি এ বিষয়ে আমার মতের সমর্থনই করেছিল। আরও লিখেছিল যে অনিলার ঐ রকম মতামত নিশ্চয়ই যতদিন ওর বিয়ে না হচ্ছে কেবল ততদিনই থাক্‌বে, বিয়ে হ'য়ে গেলেই একটা আমূল পরিবর্ত্তন হ'বে।

নাত্‌নীর বিয়েতে সাধারণতঃ ঠাকু'মারা যতটা উদ্বিগ্ন হয় আমি এমন অবস্থায় পড়ে গেলাম যে তার চেয়ে বেশী উদ্বেগ সইতে হ'ল। মণি সংসারের কী-ই বা জানে? বিয়ে যে শুধু একটা কাব্যময় ব্যাপার নয়, ওর ভিৎ যে অতিশয় স্থূল, তার জন্য প্রস্তুত আছে কি না কে জানে? তবে ছোটবেলা থেকে যখন যা জান্‌তে চেয়েছে সাধ্যমত তার উত্তর দিয়েছি, মণি ত' একেবারেই মুখ্যু নয়। ভেবে চিন্তে লিখ্‌লাম:

মণি,

বন্ধুত্বের একটা মস্ত সুবিধা হ'ল যে ইচ্ছা হ'লেই তাকে ভেঙ্গে খালাস হওয়া যায়। কিন্তু বিয়ের বেলা তা' হয় না। হয়ত' বা কোনও কারণে বিয়ের বন্ধনটা কেটে ফেলে দেওয়া গেল, কিন্তু সন্তানের টান কোনমতেই ফেলে দেবার নয়। কাজেই এমন অনেক কিছুকে অনেক সময় গ্রহণ ক'রে নিতে হয়, যা'র সঙ্গে মন ঠিক সায় দেয় না।

স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য স্বামীর প্রতি, এবং স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি। পরস্পরের সুখ ও মঙ্গল পরস্পরে সাধন করবে। অনেক সময় তার জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করতে হ'বে। তবে সর্বদা যদি পরস্পরের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যায়, এ কাজও তেমন শক্ত হয়ে ওঠে না। বিবাহের দৈহিক দিক্‌টাও সুন্দর হ'য়ে ওঠে। কারণ প্রকৃতি

সাধারণতঃ সুন্দরই হয়ে থাকে। যেখানে হয় নি সেখানে তাকে সুন্দর ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করবে শিক্ষা ও সুরুচির সাহায্য দিয়ে। বুড়ো ঠাকু'মা সর্বদা তোমাদের সুখ চিন্তা করবে। ইতি।

আমার নাত্‌নী মণিমালার বিয়ের আগে তা'কে আরও যে কত চিঠি লিখেছিলাম তার হিসাব নেই। একবার লিখেছিলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য, যেমন নিজের শক্তির পরিচর্য্যা করা, যেটুকু রূপলাবণ্য ভগবান যাকে দিয়েছেন, সেটুকুর যত্ন করাও প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

তুমি যে নতুন ক'রে একটা পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ তার জন্য কেবলমাত্র নিখুঁৎ জিনিস নিবেদন করতে চেষ্টা করবে না? মন্দ স্বাস্থ্য দিয়ে দুনিয়াতে কোনও কাজ হয় না। আমাদের দেশের মেয়েরা যে মনে করে ছোট ছোট রোগ গোপন করে ভারী নিঃস্বার্থ কাজ করলাম, এটা যে কত বড় ভুল, সে তুমি নিজেও একাধিকবার লক্ষ্য করেছ। তোমার সংসারে অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে যাবে, তোমার ছেলেমেয়েদের অটুট স্বাস্থ্য দান করবে। যাতে সুদূর ভবিষ্যতে তারা না বল্‌তে পারে "আমার এই ভাঙ্গা শরীরের জন্য আমার মা দায়ী।" যে দেশের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ভালো না সে দেশ কখনও বড় হ'তে পারে না। এই সব কারণে তোমার স্বাস্থ্য ভালো ক'রে পরীক্ষা করিয়ে নাও, কোনও দোষ থাক্‌লে সেটার প্রতিকার ক'রে নাও।

তারপর সব চেয়ে বড় কথা, স্বাস্থ্যহীন নারী তার স্বামীর অশেষ দুঃখের কারণ হয়। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মনের শান্তি সবনষ্ট হয়ে যায়। কোথায় পরস্পরের সেবাযত্ন ক'রে একটা গভীর সাহচর্যের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, না স্ত্রীর সেবা ক'রে ক'রেই স্বামী ক্লান্ত হয়ে যায়। আমি যে কত মেয়েকে এই নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি সে আর কি বল্‌ব। "আমার আবার হার্টের রোগ কিনা ভাই, তাই উনি আমায় কুটোটি ভাঙ্গতে দেন না। আপিস থেকে ফিরে আগে আমাকে ওষুধ দিয়ে, তবে কাপড়চোপড় ছাড়েন" ইত্যাদি। যেন কত বলে বেড়াবার বিষয় হ'ল।

ক্রমাগত শুনেছি মেয়েরা নিজেদের সাংঘাতিক রোগ নিয়ে দস্তুর মত প্রতিযোগিতা করছে, যার যত ব্যামোব্যাধি যেন বাহাদুরী তার তত বেশী। পাপ যেমন বর্জনীয় রোগও তেমনই হওয়া উচিত। যে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে সে যে কি ঘোর অন্যায় করে তার সীমা নেই। সেইজন্য তোমার নিজের পারিবারিক জীবনের সুখের জন্য এখন থেকেই যদি কোনও রোগের ছায়াও দেখ্‌তে পাও তা'কে দূর কর। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

আরেকবার ঐ প্রসঙ্গেই লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

রোগের কারণটা লজ্জার কারণ হ'তে পারে, কিন্তু রোগটা সারাতে চেষ্টা করাটা সর্বদাই প্রশংসার যোগ্য। বাইবেলে আছে পূর্বপুরুষের পাপের ফলে, তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষ অবধি রোগের

উত্তরাধিকারী হ'তে পারে। এটা দুর্ভাগ্য বই আর কিছু নয়, আর যদি নিজের অপরাধে রোগ হয় সেটা নিজের দোষ হ'লেও উভয় ক্ষেত্রেই রোগ গোপন করাটাই হ'ল অন্যায়।

সেকালে যে সব অসুখকে ভগবানের অভিশাপ বলে মানুষ মেনে নিত, আজকাল বিজ্ঞানের হাতে পড়ে তারাও নির্মূল হচ্ছে, এখন ত' রোগ গোপন করবার কোনও কারণই নেই। তুমি নির্দোষ নিষ্পাপ নাতনী আমার, কিন্তু তোমার মধ্যেও যে পূর্বপুরুষদের রোগের বীজাণু লুকিয়ে নেই কে তা জানে। সেইজন্য আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ বংশের মুখ চেয়ে পাত্রপাত্রীর উভয়েরই অপ্রত্যাশিত রোগের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এ বিষয়ে কোনও সঙ্কোচই থাকা উচিত নয়। ইতি।

আরেকখানি চিঠিতে লিখেছিলাম—

মণি,

আমাদের দেশে একটা দুর্দ্ধর্ষ সাত্ত্বিক ভাব আছে যেটা মানুষকে পৃথিবীর ভালো জিনিসকেও উপভোগ করাতে বাধা সৃষ্টি করে। যেন সাজাগোজা, ভালো খাওয়াটা খুব বড় অপরাধ। বল ত' আমরা কত বড় অভাজন যে নির্দোষ আনন্দেরও ভাগীদার হ'তে আমাদের আপত্তি? ভোগ কেবল তখন অন্যায় হয় যখন সে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, নিজের বা অপরের দুঃখের কারণ হয়। নইলে বয়সোপযোগী সাজসজ্জাতে কোনও দোষ নেই, আমোদ-আহ্লাদে কোন দোষ নেই। অবশ্য এসব জিনিসের জন্য কর্তব্যের অবহেলা ক'রো না, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট ক'রো না, ছেলেপুলের অযত্ন ক'রো না, আত্মীয়স্বজনের প্রতি অনাদর দেখিও না।

আমোদ-প্রমোদ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জীবনের নক্সাতে তাদেরও একটা ছোট জায়গা আছে। বিপদ হ'ল, স্বার্থপর হয়ে যাবার আশঙ্কা থাক্‌তে পারে। নিজেরা সিনেমা থিয়েটার দেখ্‌লাম, রেস্তোরাঁতে খেয়ে, নানান্ জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ালাম, আর আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ছেলের অসুখে ওষুধ কিন্‌বার পয়সা জোগাড় হচ্ছে না, এমন যেন না হয়। ভোগের জিনিসকে যেমন আদর ক'রে নিতে পারা চাই, আবার তেমনি ক'রে এক মুহূর্তে অকাতরে প্রত্যাখ্যানও করতে পারা চাই। ভোগ ক'রো, কিন্তু ভোগাসক্ত হ'য়ো না।

অনেক সময়ই দেখা যায় যাঁরা বয়সকালে নানান্ ভাবে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে, নিজেদের বঞ্চিত করেছে, মনের মধ্যে তাদের নানারকম নালিশ অভিযোগ জমা হ'তে থাকে, নিজেদের তা'রা অভাবের কোঠায় বসিয়ে রাখে, আর তার ফলে একটু বয়স হ'লে, যখন ভোগের তাগাদা মন্দ হয়ে আসা উচিত, তখন তাদের মনে এমন একটা তিক্ত অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয় যে তারা আর অপর কারো সুখভোগ দেখ্‌তে পারে না, আবার নিজেদের মনেও শান্তি পায় না। প্রকৃতির বিপক্ষে গেলে এমন হয়। সেইজন্য তোমাদের বিবাহিত জীবনে আনন্দ উপভোগের ঠাঁই রেখো, মাত্রা ঠিক রাখ্‌লে, তা'তে তোমাদের মঙ্গলই হ'বে। ইতি।

আরও লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

সেকালের মুনি-ঋষিরা সুসংযত জীবনের বেশ একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন—শৈশবের পর গুরুর বাড়িতে শিক্ষা দীক্ষা

ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য, তারপর পঞ্চাশোর্দ্ধে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ, তারপর যতি। আজকাল আর ঠিক সেই নিয়মগুলো না খাট্‌লেও, ওর থেকেই একটা কাঠামো তৈরী ক'রে নেওয়া যায়। যেটা আমাদের এ যুগের উপযুক্ত হবে।

যেমন ধর না, যদিও আজকাল ১৫।১৬ বছর বয়সে আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া সাঙ্গ করা দূরে থাকুক্, কী পড়বে না পড়বে স্থিরই করে না অনেক সময়, তবুও এটুকু মেনে নেওয়া যায় যে পড়াশুনা শেষ হ'লে বিবাহ ও ছেলেমেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়ালে সংসার থেকে সরে দাঁড়ানো। দেখা যায় ঐ স'রে দাঁড়ানোটা বিষম কঠিন কাজ। তুমি এক বিষয়ে সুখী হবে, ঐ স'রে দাঁড়াতে পারছে না এমন গুরুজনের সঙ্গে বাস করতে হ'বে না। কিন্তু তাই বলে তোমার ভাবী শ্বশুরের প্রতি তোমার কর্তব্য নেই এ কথা মনে ক'র না। এখন তুমি জীবন উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সব কর্তব্য পালন করতে পারবে ত' ?

জান ত' মাঝে মাঝে আমোদ করাটা পর্যন্ত একটা কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। তোমার স্বামী কাজ সেরে বাড়ি এসে বল্‌ল—চল আজ একটা সিনেমাতে যাওয়া যাক্। আর তুমি অমনি বলে বস্‌লে—"ও মা ! সে কি ক'রে হ'বে, আমি যে আজ সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, শ্রীমন্তকে ছুটি দিয়েছিলাম, এখন আর বেরোতে ইচ্ছা করছে না।" কিংবা—"এ মা, না, ও ফিল্মটা ভালো না—।" কিংবা "না, সে হয় না, আমার আজ পিসিমার বাড়ি যাবার ইচ্ছা।" অর্থাৎ তোমার স্বামীর সুখের অংশীদার তোমাকে হ'তে হবে। তবে সে যদি অন্যায় কথা বলে বা কর্তব্যের কথা ভুলে যায়, সেটাও তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। পারবে ত' এই সব দিদিমণি ? খুব পারবে। ইতি।

মাঝে মাঝে স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর সব কথা হ'ত আমাদের। একবার লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

সেই পুরোন নিয়মটি বেশ ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা লোমের জামা প'রে, পাথরের একটা হাতুড়ি কাঁধে ফেলে জঙ্গল থেকে জীবজন্তু মেরে আন্‌ত, শত্রুদের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করত। আর মেয়েরা আগুন পাহারা দিত, একবার নিভে গেলে জ্বালানো মহা মুস্কিল, রাঁধা-বাড়া করত, লোমের পোষাক ঘাসের পোষাক তৈরী করত, ছেলেমেয়ে মানুষ করত। দিব্যি কাজ ভাগাভাগি ছিল, কোনও ঝগ্‌ড়াঝাটির স্থযোগ ছিল না। কিন্তু তখন মেয়েদের স্বাধীনতাও ছিল না। এখন তাদের ব্যক্তিগত জীবন, পছন্দ-অপছন্দ ও স্বাধীনতাজ্ঞান হয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তুমি আজকালকার মেয়ে তোমাকে এই পরিবেশটাই গ্রহণ করে নিতে হ'বে।

তোমার রোজগার করবার দরকার হ'বে না, যদি হ'ত, তা' হ'লে বাড়িতে বসে হাহুতাশ না করে রোজগার করতে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু রোজগার করতে না হ'লেও শোভন ঠিক যতখানি কষ্ট স্বীকার করবে সংসারটার জন্য, তোমাকেও তাই করতে হ'বে। তোমাদের বাড়িটাকে সুখ ও শান্তির একটা আশ্রয় ক'র। তোমার ছেলেমেয়েদের স্নেহ ও শিক্ষা দিও। তোমার স্বামীকে সুখী ক'র।

সে বাড়ি আসামাত্র—আমার এটা হ'ল না, ওটা হ'ল না, তোমার পিসি এই বল্‌ল, ঐ বল্‌ল, কেন তুমি এটা করলে, ওটা দিলে, ইত্যাদি কদাচ মুখে এনো না।

তোমার ছেলেমেয়ে ছোট থাক্‌লে তুমি তাদের আগ্‌লাবে। স্বামীর কাছে তাদের নামে নালিশ করবে না। তোমার ঝি-চাকর

তুমি সাম্‌লাবে, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে স্বামীর কাছে অভিযোগ করবে না। এসব হ'ল তোমার এলাকা। এখানকার আধিপত্যও যদি স্বামীর ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা কর, এমন একদিন আসবে, যখন তুমি নিজেই তোমার হারানো রাজত্ব নিয়ে অনুশোচনা করবে। ইতি

কত যে সাংসারিক উপদেশ দিতাম মণিকে এখন ভাব্‌লে নিজেই অবাক্ হই। লিখ্‌লাম—

মণি,

নিজের অবস্থামত সর্বদা চল্‌বি। যারা তোদের চেয়ে বেশী ধনী, তাদের সঙ্গে টেক্কা দিস্ নে। আর যারা তোদের চেয়ে কম ধনী, তাদের উপর চাল দিস্ নে। আহারে-বিহারে মাত্রা রেখে চলিস্, প্রয়োজনীয়তা ও পছন্দ মেনে চলিস্, মিষ্টার চৌধুরীরা রূপোর বাসন কিনেছে, মিষ্টার মেহ্‌টা সিল্কের পর্দা করেছে ত' তোদের কী? মনে রাখিস্ সুখের ভাগীদার পাওয়া যায় কিন্তু দুঃখের ভাগীদার পাওয়া দায়। আরেকটা কথাও মনে রাখিস্, যদি বা দুঃখের সময় সহানুভূতি করবার লোক পাবি, সৌভাগ্যের সঙ্গে সত্যিকার সহানুভূতি করবার লোক পাওয়া দায়। এই দুটি সত্য পরস্পরবিরোধী নয়। তোর সুখভোগের ভাগ নেবার ঢের লোক পাবি, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তোর সৌভাগ্যে সত্যি খুসি হবে, তাদের বেশীর ভাগই মনে মনে তোকে হিংসা করবে ও নিজেদের কৃপণ-ভাগ্যকে গঞ্জনা দেবে। তোর দুঃখের সময় তার ভাগ নেবার লোক কোথায় পাবি? কিন্তু তোর দুঃখ দেখ্‌লে হয় ত' অনেকের সত্যি দুঃখ হ'বে। এর বেশী আশা

করিস্ নে। এবং এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে মনে মনে মেনে নিয়েও বন্ধুবান্ধবের আদর আপ্যায়ন করিস্। ইতি।

আরেকবার লিখেছিলাম—

মণি,

টাকাপয়সার কোনও সমস্যারই তোমাকে এতদিন সমাধান করতে হয় নি। সৌভাগ্যবশতঃ তোমার বাবামা'র সচ্ছল অবস্থা, তারপর চাকরী ক'রে আবার তোমাকে নিজের ছাড়া অপর কারো ভাব্না ভাব্তে হয় নি। যা রোজগার করেছ, প্রয়োজনমত ও ইচ্ছামত খরচ করেছ।

কত রকম সমস্যাই যে উঠ্বে দিদিমণি। একটা কথা মনে রেখো; পারতপক্ষে তোমার স্বামীর কাছে গোপন ক'রে কোনও কাজ ক'রো না। তার অমতে তার রোজগার করা টাকা খরচ করবার তোমার কতখানি অধিকার আছে ভালো ক'রে চিন্তা ক'র। তোমাদের ত্ু'জনার মধ্যে গভীর ভালোবাসা থাক্লেও তোমার নিজের রোজগার করা টাকা যেমন যখন-যেমন-ইচ্ছা খরচ করেছ, তোমার স্বামীর টাকা খরচ করবার আগে মনে মনে চিন্তা ক'র সে এটা সমর্থন করত কি না। তাকে সব সময়ে জিজ্ঞাসা ক'রে বিরক্ত ক'র না, কিন্তু তোমার নিজের যদি মনে হয়, তার আপত্তি হ'ত, সে খরচ ক'র না। টাকা বড় বিশ্রী জিনিস। ও নইলে চলেও না, অথচ সংসারের মাধুর্য নষ্ট ক'রে দেবার ওর ক্ষমতা আছে।

তারপর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরা ধার চাইলে কী করবে? জান ত' সেক্সপীয়র বলেছিলেন—ধার করবেও না, ধার দেবেও না। ধার করলে মিতব্যয়িতার অভ্যাস চলে যায়, আর ধার দিলে

ধারের টাকা ত' নষ্ট হয়-ই, মাঝখান থেকে বন্ধুত্বটুকুও নষ্ট হ'য়ে যায়। যদি বন্ধুর বিপদে টাকা ধার দাও, এমনভাবে দেবে যে বন্ধু টাকা শোধ না করলেও তোমার সর্বনাশ হ'বে না। অর্থাৎ ধার দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ধারের উপর দাবীটুকু যদি ছেড়ে দিতে না পার, তা' হ'লে ধার দেবার মত তোমার অবস্থা নয়, কাজেই ধার দিয়ো না। আরেকজনের সংসার উদ্ধার করবার জন্য তোমার সংসার ডুবিও না। তোমার সংসারের তুমি রক্ষাকারী, সে দায়িত্ব-টুকু ত্যাগ করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। তুমি সুখী হয়ো দিদিমণি, সবাইকে সুখী ক'র। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

দশ

শেষ পর্যন্ত নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে, আমার নিজের বাড়িতে নাত্‌নীর বিয়ে দিলাম।

ভালোভাবেই কাজ সম্পন্ন হ'ল, তবে আমাদের দেশে লাখ কথার কমে কোনও শুভ কাজই হয় না তা' ত' আপনারা জানেনই, কাজেই অনেক কথাও উঠ্‌ল।

বিয়েতে ওর মা-বাবা যোগ দিলেন না, কাকা-কাকীরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত এসেছিলেন। শীতের আরম্ভে আমার বাড়িতে আমার প্রথম নাত্‌নীর বিয়ে ভালোভাবেই হ'ল।

বিয়ের পরদিন মণিমালা শ্বশুরবাড়ি গেল, মুখখানি শুক্‌নো, কিন্তু চোখে জল নেই, ঠোঁটে হাসি। কী একটা সুগভীর স্নেহে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল কি আর বল্‌ব। মনে মনে বার বার বল্‌লাম—দুঃখের হাত থেকে ওকে বাঁচাবার আমার শক্তি নেই, কিন্তু বুক পেতে সুখদুঃখ গ্রহণ করবার ওর যেন শক্তি হয়। ওদের বাড়িতে মহা ধুমধাম হ'ল। মণির আদরের কোনও ত্রুটি রইল না। মাসখানেক পরে মণিকে এই চিঠিখানি লিখেছিলাম—

স্নেহের দিদিমণি,

যাবার সময় যখন দেখ্‌লাম তোমার চোখে জল নেই, মুখে হাসি, আনন্দে আর গর্বে আমার বুক ভরে গেল। আমার নাত্‌নীর মনের জোর আছে, দুঃখকে পরাজিত ক'রে সে সুখী হ'তে জানে।

আমার নাত্নী দুর্বল, ছিঁচ্কাদুনে, অসহায় নয়। সহায় আবার কি দরকার! তোমার স্বামীকে তুমি ভালোবেসো, তোমার কর্তব্য পালন ক'র, আর কোনও সহায়ের প্রয়োজন হবে না, দেখো। আমার কানে সব কথাই পৌঁছয়, দিদিমণি। আমি জানি তোমার কাকীরা তোমাকে গঞ্জনা দিয়েছে, মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়েছ বলে। এ কথা সত্যি যে মা-বাবার মনে ক্লেশ দিতে হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে ক্লেশ দেওয়ার চেয়েও বড় প্রশ্ন ওঠে। তোমার কাছে মা-বাবার দাবীর চেয়েও বড় দাবী হ'ল, তোমার নিজের পরমাত্মার দাবী। এ পৃথিবীতে স্বাধীন বুদ্ধি ও হৃদয় নিয়ে যে জন্মেছ, নিশ্চয় তার একটা উদ্দেশ্য আছে। তোমার জীবনের সফলতা বিফলতার জন্য একমাত্র তুমি দায়ী। তোমার বাবা-মার কোনও অধিকার নেই তোমার জীবনের উপর তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ আরোপ করবার। যদি বাস্তবিক কোনও আপত্তির কারণ থাক্ত, তা' হ'লে অবশ্য বাধা দেওয়াই তাঁদের কর্তব্য হ'ত, কিন্তু যেখানে শুধু পছন্দর কথা ওঠে, সেখানে তাঁদের কোনও অধিকারই নেই। আমার মনে হয় না যে তোমার মনে কোনও রকম দ্বিধা আছে, তবুও বিয়ের দিনে ওকথা শুন্লে মনটা একটু খারাপ হ'তে পারে বলে এতগুলো কথা লিখ্লাম।

তোমার ঘরকন্নার কথা আমাকে লিখ্বে কিন্তু, শুন্বার জন্য আমি উদ্গ্রীব হ'য়ে আছি। ইতি।

ঠাকু'মা।

নাটক নভেলের শেষে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যখন নায়ক নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিকারের জীবনে ঐখান

থেকেই হয় সমস্যার সুরু। দুজন ভিন্ন পরিবেশের, ভিন্ন রুচির মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করছে, সে এক মহা ব্যাপার। এই সময়ে মণিমালাকে লিখ্‌লাম—

স্নেহের দিদিমণি,

শোনা যায় যে বিয়ের পর প্রথম বছরটাই সব চেয়ে কঠিন, যখন দু'জন দু'জনার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছ। এই সময়ে ভুল বোঝার ও মান-অভিমানের সম্ভাবনাও সব চেয়ে প্রবল। একটা বিষয়ে সাবধান হ'বে, নিজের মনের ভাব, অভিমান ক'রে গোপন ক'রো না, নিজের ভুল স্বীকার করতে পিছপাও হ'য়ো না। তোমাদের বিবাহিত জীবনটা আগেকার কালের লোকদের চেয়ে অনেক বেশী জটিল, কারণ সেকালে ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে হ'ত, তারা শ্বশুরবাড়ির ছাঁচেই ঢালাই হয়ে যেত, খাপ খাওয়াবার কোন কথাই উঠত না। যদি কোনওরকম সমস্যা উঠ্‌ত তারও সহজেই সমাধান হয়ে যেত। আমার দিদিশাশুড়ির মুখে শুনেছি, তিনি দাদাশ্বশুরকে ধরে নিয়মিত পিট্‌তেন, দাদাশ্বশুর বেচারা গায়ের জোরে পার্‌তেন না ব'লে মায়ের কাছে নালিশ ক'রে বৌকে বকুনি খাওয়াতেন, তাই আবার পরে 'কেঁইচি'-পনার জন্য পিট্টি খেতেন! ঐ মারামারির সম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে নাকি মেলা কষ্ট পেতে হয়েছিল।

যাই হোক্ তোমাদের সম্বল কেবলমাত্র ঐ প্রেমের সম্বন্ধটি, ওটিকে নষ্ট হ'তে দিয়ো না। তার প্রথম নিয়ম হ'ল যে স্বামীকে বিশ্বাস ক'রো, মনের মধ্যে ঈর্ষার স্থান রেখো না। তোমায় বিশেষ ক'রে বল্‌ছি, কারণ তোমার স্বামীর কর্মজীবনেই বহু সুন্দরী ও গুণসম্পন্না মেয়ের সঙ্গে দেখাশোনা হ'বে। তা'দের হিংসা ক'রো

না। যে মুহূর্তে মনের মধ্যে ঈর্ষার স্থান দিলে, সেই মুহূর্তেই মনে মনে পরাজয় স্বীকার করলে, ভেবে নিলে তোমার নিজের যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। আমি বুড়ো হয়ে গেছি দিদিমণি, আমার একটা কথা মেনে নিও, প্রেমের সম্বন্ধে রূপ, এমন কি গুণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, প্রেমটাই সর্বদা প্রথম। তোমার ঐ চেহারা ঐ গুণাবলী দেখেও যখন শোভন তোমাকে বিয়ে করেছে, তখন বুঝ্‌তে হ'বে ওতেই সে সন্তুষ্ট। এখন তোমার কর্তব্য হল সাধ্যমত তোমার যেটুকু রূপলাবণ্য আছে তা'কে রক্ষা করা, যেটুকু গুণ আছে, তার যত্ন করা। নিজেকে ভালো হ'বার সুযোগ দিও, আর পাঁচজনার কাছে পাঁচরকম বিদ্যা শিখে নিও, কিন্তু কদাচ নিজের গুণগুলি হারিও না। যার জন্য শোভন তোমাকে বিয়ে করল, সেগুলি নষ্ট করলে তা'কে প্রবঞ্চনা করা হবে, একথা ভুলো না।

তারপর আরেকটা কথা হ'ল, যেমন দিন যাবে শোভনের মধ্যেও ছোটখাট খুঁত দেখা দেবে। খানিকটা তাকে গড়েপিটে মানুষ ক'রে নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে যদি তার আমূল সংস্কার করতে চেষ্টা কর, শেষ পর্যন্ত দেখ্‌বে একটা নতুন প্রাণীর সৃষ্টি করেছ, যার মধ্যে তোমার সেই ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে বের করা মুস্কিল। তাই ওকাজও ক'রো না। তাছাড়া একটু আধটু খুঁত থাকা ভালো, নইলে তোমার সঙ্গে মানাবে কেন? তোমার ক্ষমাশীল ঠাকু'মার চোখেও যে তোমার শত শত খুঁত ধরা পড়ে, শোভন যদি নিখুঁত হ'ত, তোমাকেই বা সে বিয়ে করত কেন? ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

আরেকটা চিঠি শুনুন—

দিদিমণি,

একটা রফা ক'রে ফেল গোড়া থেকেই। যে যে জিনিস তুমি দেখ্‌তে পার না আর যে যে জিনিস শোভন দেখ্‌তে পারে না তার একটা ফর্দ ক'রে ফেল, আর সেই মিলিত ফর্দে যা' যা' থাক্‌বে সব বাড়ি থেকে দূর ক'রে দাও। তা' হ'লে দেখ্‌বে শান্তিরক্ষার কতটা সুবিধা হবে।

বিশেষতঃ খাওয়া শোয়া সাজসজ্জা বিষয়ে। ওসব তুচ্ছ জিনিসের জন্য যেন অশান্তি না হয়। তার মানে তোমাদের বাড়িতে তোমার পক্ষ থেকে তেজপাতা, পিতলের ফুলদানি আর মেমদের গান বন্ধ হ'ল। আর শোভনের পক্ষ থেকে সজ্‌নে ডাঁটা, বেড়াল আর কবিতা লেখে যে মেয়েরা তারা বন্ধ হ'ল। গোড়াপত্তনের পক্ষে এই যথেষ্ট, বাকী ফর্দটা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে সেরে ফেল, পরস্পরের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হ'য়ো, তেজপাতা না হ'লে শোভন যদি সুখী না হয়, না হয় দু চারটে বাড়িতে এলই বা। কী করলে না করলে জানিও। ইতি।

ঠাকু'মা।

আরেকখানি চিঠি থেকে খানিকটা পড়ে শোনাই, এটি নিতান্ত আমার মনের কথা, নাত্‌নীকে গোপনে বলা।

স্নেহের মণিমালা

দেখ দিদিমণি, আমার বিয়ের পর আমার পিস্‌শাশুড়ি একদিন

আমাকে চুপি চুপি ডেকে বলেছিলেন "দেখ্‌, মেজবৌ, বাইরে বাইরে নরম সেজে থাক্‌বি ভিতরের মতামতগুলো শক্ত করে রাখ্‌বি। মুখে তর্ক করবি না, কাজে এক ইঞ্চি ছাড়বি না। যদি ছেড়ে দিস্‌, দেখ্‌বি তার পরের ইঞ্চিটার উপরও নজর দিচ্ছে, সেটিকেও রক্ষা করা মুস্কিল।" অর্থাৎ কিনা ভালোবাসার মানুষটিকে বেশী আস্কারা দিলে মাথায় চড়ে বসে। তবে কিনা কথায় কথায় ঝগড়াঝাটি করতে নেই, মনের ভিতর নিজের অধিকারগুলো স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে পারলে, বাইরে বরং খানিকটা খানিকটা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। উদার হ'তে হয়, দুর্বল হ'তে হয় না।

একটা বিষয়ে শক্ত হ'বে। বাড়ির ভিতরের ব্যবস্থায় তুমি সর্বদা কর্ত্রী হ'বে। স্বামীর মনের মত ক'রে সর্বদা কাজ করতে চেষ্টা করবে, যদি না তোমার বিবেকে বাধে, বিবেকে বাধ্‌লে মুক্ত-কণ্ঠে বল্‌বে, গোপন করবে না। গোপনীয়তার জন্য কত ভালোবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, কারণ পরস্পরে বিশ্বাস হারালে আর প্রেমকে জোড়া দেওয়া যায় না। দিদিমণি, একথা কখনও ভুলো না, সংসার বড় স্থূল ও নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ায় প্রেমকে যদি রক্ষা করতে না পার।

তারপর ঐ যে বল্‌ছিলাম বাড়ির ভিতরটা হ'ল তোমার এলাকা। রান্নাঘরে স্বামীদের নাক ঢোকাতে দেওয়া উচিত নয়। এমন কি আমার মতে ভালো স্বামীরা রান্না সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবেই না। তারা জান্‌বে নিজেরা কী খেতে চায় না চায়, এবং জিজ্ঞাসা করা মাত্র সরল ভাষায় সে কথা প্রকাশও করবে, কিন্তু কেমন ক'রে যে সে জিনিস প্রস্তুত করতে হয় না হয়, সে বিষয়ে পুরুষ মানুষরা যত কম জানে তত মঙ্গল। শোভন যদি কখনও বলে

"ওমা, ছোলার ডালে তরকারি দিয়ে রেঁধেছ কেন? আমার মা ত' কখনও দিতেন না।" তখন একটু হেসে নরম গলায় ব'লো, তোমার মা ত' কখনও মুর্গী রান্না করতেন না, আমি ত' তাও করি। খেয়েই দেখ না কেমন।" খবরদার রেগে যেও না, তর্ক ক'রো না। জান ত' পুরুষরা কত বোকা হয়। রান্না-জানা পুরুষ মানুষদের কখনও প্রশ্রয় দিতে হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ তারা অধিকাংশ সময়ে শুধু মুখেই তা'র প্রমাণ দেয়, কাজে তেমন নামে না। যে স্বামী বাজার থেকে মাছ এনে শুধুমাত্র এইটুকু বলে ক্ষান্ত হয় না "ভালো ক'রে রেঁধো"—বা নিদেন্ "সর্ষে-মাছ কর" কি "ভাজা ক'রে দাও"—যে স্বামী এর চেয়ে বেশী বল্‌তে চেষ্টা করে—দেখ, ঝোলটা যেন লাল্‌চে হয়, আর থক্‌থকে হ'য়ে নীচে পড়ে থাক্‌বে, তেল উপরে ভেসে উঠ্‌বে এমন যেন না হয়—বুঝলে কি না বেশ ঘেঁটো ঘেঁটো হয় যেন—ইত্যাদি, এসব স্বামীদের যদি অতিশয় কড়া শাসনে না রাখা যায়, জীবনযাত্রা অতিশয় কঠিন হ'য়ে পড়ে, তাই তোমাকে আগে থাক্‌তেই সাবধান ক'রে দিচ্ছি, দিদিমণি।
ইতি

ঠাকু'মা।

আরেকবার লিখেছিলাম—

মণি,

তোমার দার্জিলিংএর সেই বন্ধুটিকে মনে পড়ে, মণি? যার স্ত্রীর জন্য অনেকদিনের পুরোন বন্ধুত্বটিকে তোমার ছাড়তে হয়েছিল?

তুমি যেন আবার তোমার স্বামীর বিয়ের আগেকার বন্ধুদের ভাগাতে চেষ্টা ক'রো না। তার জীবনের যা' কিছু ভালো, সব যদি নষ্ট ক'রে দাও, তুমি একলা ত'ার ক্ষতিপূরণ করবে কী করে? তার জীবনে তোমার স্থান ত' এত সঙ্কীর্ণ নয় যে আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবকে সরিয়ে তবে তোমার জন্য একটুখানি জায়গা করা সম্ভব হ'বে। যদি তার বন্ধুবান্ধবদের একটা চান্স না দাও, তা' হ'লে তুমি অন্যায় করবে। তাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকে যার সঙ্গ খুব বাঞ্ছনীয় নয়, তা'কেও হঠাৎ ঝেড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা না ক'রে, আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠা ঢের ভালো।

এক কথায় বল্‌তে গেলে স্বামীকে সুখী কর, হাড় জ্বালিও না। অনেক ভালোবাসা নিও। ইতি।

ঠাকু'মা।

মাঝে মাঝেই মণির কাছ থেকে চিঠি পেতাম, এখনও পাই। মণির বিয়ের পরে লেখা চিঠিগুলি ত' হালের কথা। একবার লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

কাল তোমার জন্মদিন, সেইজন্য তোমাকে এই কাপড়খানি পাঠালাম। নতুন কাপড় পরে শোভনকে সঙ্গে নিয়ে, তোমার মা-বাবাকে প্রণাম ক'রে এসো। যদি তাঁরা তোমাদের

গ্রহণ করেন, তা' হ'লে সে ত' পরম আনন্দের বিষয় হ'ল। আর যদি না-ও করেন, তা' হ'লেও কোনও ক্ষতি নেই। যে মা-বাবা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আবার তোমার মান-অপমান কী? আর শোভনের বা মনে করবার কী থাক্‌তে পারে, সে ত' তোমার মার কাছে এমন ভালো স্ত্রী পাবার জন্য ঋণী।

যাই হোক্, তোমাদের জীবনে কোনও ক্ষোভের অবকাশ রেখো না। যেন বহুদিন পরে না মনে হয়, আমি একটু চেষ্টা করলাম না কেন! সত্যি কথা বল্‌তে কি, কাল গিয়েছিলাম একবার ওদের বাড়িতে। এটুকু বুঝলাম যে তোমরা একবার গেলেই তাঁরা গলে জল হ'য়ে যাবেন। শোভনকে নিয়ে যেয়ো, দিদিমণি। ইতি

মণি তাই শুনে গিয়েও ছিল। সেখানে কান্নাকাটি আদর-আপ্যায়ন মণ্ডামিঠাই-এর এক বিরাট পর্বও হয়েছিল। শুনে আমি কত যে খুসি হয়েছিলাম বল্‌তে পারি না। তবে কিনা শান্তি-প্রিয় মানুষ আমি, ভাগ্যিস্ সেখানে ছিলাম না!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছায়াবাজির মত আমার নিজের জীবনটা কেটে গেল। কত কী যে করব বলে মনে করেছিলাম, সখও কত রকমের ছিল, কিছুই তার হয়ে উঠ্‌ল না। আর যে তার সময়ও নেই একথা ভেবে অবাক্ লাগে। মনে হয় আমার ছেলেবেলা ত' সেদিনের কথা। এদিকে আমার নাত্‌নী মণিমালাও কত বড় হয়ে গেছে, তা'রও নিশ্চয় কত কী করবার ইচ্ছা আছে, কত সখ আছে; সেও নিশ্চয় ভাব্‌ছে তাড়াতাড়ি কিছু নেই, সাম্‌নে দেদার সময় পড়ে আছে। আমার যেগুলি হ'ল না, আমার মণিমালারও সেসব হ'বে

না ভেবে অসহ্য লাগে। মাঝে মাঝে তা'কে সাবধান ক'রে দিই, লিখি—

দিদিমণি,

নিজের সখসাধগুলো খানিকটা অন্ততঃ পূর্ণ ক'রে না নিলে, পরে যখন হাতে সময় থাকে না, তখন অনুশোচনা হ'বার আশঙ্কা থাকে। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বলে আর যে তোমার সাজ্‌বার গুজ্‌বার, খাবার-দাবার, বেড়াবার কুড়োবার সখ সব মিটে গেছে এ আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। তবে এটুকু বিশ্বাস করি যে তুমি এমন সুখ লাভ করেছ যার কাছে ছোট ছোট হতাশা-গুলো ঘেঁষতেই পারে না। কিন্তু তাই বলে যদি কোথাও যাবার সখ থাকে, কিছু কিনবার সখ থাকে, সুযোগ হ'লে সেগুলি মিটিয়ে নিও, মনে খেদ জমবার অবকাশ রেখো না। পরে যদি মনে হয় আমার বিয়ে হয়ে গেল বলে এটা হ'ল না, ওটা পেলাম না, সে কিছু ভালো হবে না। তোমার এখন সখসাধের বয়স, সাধ মিটিয়ে নাও। তা' হ'লে আমার মত যখন বয়স হ'বে দিদিমণি, আমাব মত মনের শান্তিও লাভ করবে। ইতি

ঠাকু'মা।

আরেকবার লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

বাপের বাড়ির সম্বন্ধগুলো ভগবান ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, সেখান-

কার আদর ভালোবাসার উত্তরাধিকারিণী হয়েই তুমি জন্মেছ, তাতে তোমার নিজের বিশেষ কোনও বাহাদুরি নেই। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ভালোবাসার সম্বন্ধগুলিকে তোমাকে নিজে দু' হাত দিয়ে গড়ে তুল্‌তে হ'বে। বৌ সুন্দরী কি সাদামাটা চেহারা, বেশী গয়নাগাঁটি সঙ্গে আন্‌ল কি খালি হাতে এল, এসব আলোচনা সাধারণতঃ তার বিয়ের সময়ই শুধু শোনা যায়। পাঁচ বছর পর দেখবে ওসব কথা সকলে ভুলেই গেছে, তখন যাদের ব্যবহার ভালো, তাদেরই ভালো বৌ বলা হয়। দেখ ত' দিদিমণি, এখন যদি কেউ তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক তোমার নিন্দা করে, পাঁচ বছরের মধ্যে তা'কে দিয়ে তোমার প্রশংসা করিয়ে নিতে পার কি না।

একটা কথা মনে রেখো। এখন তুমি যতই আধুনিকা হও না কেন, তোমার স্বামীর পরিচয়ে তোমার পরিচয়, তুমি এখন তাদের বাড়ির লোক। বাপের বাড়িতে এসে কদাচ তাদের নিন্দা ক'রো না। সেটা একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা হ'য়ে দাঁড়ায়। আবার তেমনি ওদের কাছে গিয়ে তোমার বাপের বাড়ির ভিতরকার কথা প্রকাশ ক'রো না। মেয়েদের সারাজীবন এই দুই নৌকোয় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, এবং একমাত্র মেয়েরাই একাজ পারে, কারণ আত্মনিবেদন করা তাদের স্বভাব। স্বামীর জন্য, ছেলেমেয়ের জন্য, ভাইবোনের জন্য সারা জীবন তারা ভেবে মরে। সেই আত্মনিবেদনের সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধিও খাটাতে পারে, তা' হ'লে অনেক পারিবারিক অশান্তি ঘুচে যায়। অধিকাংশ সময়েই মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির একটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে না, মেয়েদের নিজেদের বুদ্ধির দোষে। তারা মুখ-আল্গা মানুষ হয়, এ বাড়ির কথা ও বাড়িতে ও বাড়ির কথা এ বাড়িতে এনে পৌঁছে দেয়। ইতি

এই প্রসঙ্গেই আরও চিঠি লিখেছিলাম যখন মণিমালার আহুরে ননদ এসে তাদের কাছে ছুদিন থেকে গেল।

স্নেহের মণিমালা,

তোমার রূপসী ননদের কথা শুন্‌লাম তোমার মা'র কাছে। সে নাকি ভারী বড়লোকের বৌ, গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, সারাদিন নাকি পটের বিবি সেজে থাকে, কুটোটি ভাঙ্গে না। আরও শুন্‌লাম যে দেবার বেলা বড়লোকের বৌ দিয়েছে তোমাকে সস্তা ধরণের গরদের শাড়ি অথচ আদায় করেছে জড়োয়া কানবালা। তোমার নাকি তার রূপগুণ দেখে এমনি চোখ ঝল্‌সে গেছে যে দিন-রাত খোসামুদি করেই কাট্‌ছে। শেষের কথাটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হ'লাম, কারণ তা'র মানে ওসব কথা তুমি গিয়ে বাপের বাড়িতে লাগাও নি, ওটা নিতান্ত তোমার মা-খুড়িদের নিজেদের মত।

দেখ দিদিমণি, তোমার স্বামীর ছোট বোনের যদি রূপ থাকে, যদি বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে থাকে, যদি কুঁড়ে হয়, আহুরে আহ্লাদী হয়, তা'তে তোমার কি বা এসে যায়? ছু'দিনের জন্য এসেছে, তোমার আদরের অতিথি, তাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌তে হয়। অন্যায় কথা বলে যদি, ভদ্রভাবে প্রতিবাদ ক'রো। ঝগ্‌ড়া ক'রো না। অবুঝ হ'লে সে জায়গা থেকে চলে যেও, তুমি কাজের মানুষ, বাড়িতে তোমার অতিথি, কেউ কিছু মনে করবে না। আমি যদি শুনি তোমার স্বামীর আদরের ছোট বোন তোমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা' হ'লে আমার ভারী ছুঃখ হ'বে। ইতি।

আরেকবার লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

তোমার স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তা'র আজীবন সম্বন্ধ, তুমি ত' নতুন বাসিন্দা উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। মাঝে মাঝে যদি তোমাকে বাদ দিয়ে তারা শোভনকে নেমন্তন্ন করে, তাতে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয়। সব সময় তো করে না। আমার মনে হয় তুমি খুব সুখী, শ্বশুরবাড়িতে কত আদর পেয়েছ। এ আদর রক্ষা ক'রো। কে কোথায় কি বল্‌ল না বল্‌ল, কা'কে বাদ দিয়ে কা'কে নেমন্তন্ন করল তা'তে কি এসে যায়? আমরাও ত' গল্পচ্ছলে কত লোকের বিষয়ে কত কথাই না বলি, বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হ'লে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে বলি, নইলে পেরে উঠ্‌ব কেন? ওসব আলোচনায় কান দিও না দিদিমণি, যেটুকু পাও দু'হাত ভরে, কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ ক'রো, সাধ্যমত প্রতিদান ক'রো, কারণ সেটুকু দিতেও তাদের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না।

আমি তোমাকে প্রায়ই বলি যে মনে খেদ রেখো না, যদি কারো ব্যবহারে কোনও খট্‌কা লাগে, তা' হ'লে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে দুঃখ না জানিয়ে, সর্বদা আসল লোকের কাছে গিয়ে হয় খোলাখুলি কথা বল্‌বে, নয় ত' ছোট ঘটনাটাকে গ্রাহ্যই করবে না। পৃথিবীতে এত বিরাট বিরাট দুঃখ দুশ্চিন্তা আছে যে ছোট জিনিসগুলি ভাবনা-চিন্তার যোগ্যই নয়। সেইজন্য সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ক'রো, জনাকতকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রো; আর যারা নিয়মিতভাবে

তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, দু' একবার ক্ষমা করেও যদি কিছু না হয়, তাদের না হয় তবে এড়িয়ে চ'লো। ইতি

সময় কারো জন্য বসে থাকে না ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে মণিমালার বিয়ের পর দু' বছর কেটে গেল। গত বছরের আগের বছর মণিমালার একটি খোকা হ'ল। খোকা হবে খবর শুনেই আমরা সবাই আহ্লাদে আটখানা।

মণিকে লিখ্‌লাম—

দিদিমণি,

কত যে আনন্দ হ'ল বল্‌তে পারি না। এবার নিজের শরীরটার যত্ন কর। তোমার ছেলে যেন অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়।

মাঝে মাঝে ভারী শরীর খারাপ লাগে, মন খারাপ লাগে, না দিদিমণি? আমারও বেশ মনে আছে তোমার বাবা জন্মাবার আগে আমার কেমন লাগ্‌ত। কিন্তু এটা স্বাভাবিক, কাজেই নিজেকে একটা অস্বাভাবিক কিছু মনে ক'রে নিয়ে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে জ্বালাতন ক'রে তুলো না। তোমার মেজপিসি কেমন করত মনে আছে? এ খাব না ও খাব না, এ কেন ও কথা বল্‌ল, ও কেন সে কথা বল্‌ল। আরে তোর খোকা হ'বে ত' বাড়ি শুদ্ধ সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে কেন? তুমি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাতে তোমার শরীর সবচেয়ে ভালো থাকে, সবচেয়ে আরাম পাও, তাই ক'রো। ডাক্তার-

বাবুর পরামর্শ অনুসারে খাওয়া দাওয়া করবে, মনটাকে খুসি রাখবে। এত বড় একটা আনন্দের কারণে হাঁড়িমুখ কি শোভা পায়? তা' ছাড়া তোমার মনের অবস্থার উপর যে তোমার ভবিষ্যৎ বংশের মনের অবস্থা নির্ভর করছে, সেটার কত বড় দায়িত্ব, সেকথা ভেবেছ? আমার মনে হয় তুমি এখন নিজের বাড়িতেই থেকো, তোমার মার কাছে না হয় পরে যেও। কারণ সেখানে গেলেই সবাই মিলে তোমাকে কি রকম আতুপুতু করবে তা' আমার বেশ জানা আছে। তুমি তোমার নিজের বাড়িতে, নিরিবিলিতে, বাড়ির টুকিটাকি কাজকর্ম ক'রে, বেশ চলে ফিরে বেড়াবে। স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে, সর্বদা স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু কোনও ভারী কাজ বা ক্লান্তির কাজ করবে না। তা' হ'লে দেখবে তোমার মেজপিসির মত খিট্‌খিটে স্বভাব হ'য়ে যাবে না। শোভনকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি।

তোমার ঠাকু'মা।

বলা বাহুল্য এর পর আরও বহু চিঠিপত্র লিখেছিলাম। একবার লিখলাম—

দিদিমণি,

তুক্‌তাক্, ভূতপ্রেত, মাদুলীটাদুলীর ক্ষমতার যখন আজ পর্যন্ত কোনও ভালো প্রমাণ পাইনি, ওদের উপর তোমার কাকীদের যতটা বিশ্বাস আমার ততটা নেই। তবে কয়েকটা বিষয়ে সাবধান হ'তে হয় কুসংস্কারের জন্য নয়, শরীর ভালো রাখার জন্য। আর

আমার মনে হয় তোমার কাকীরা যেসব নিয়ম কানুনের কথা বলেছেন, তাদের আদি উদ্দেশ্য ছিল ঐ স্বাস্থ্য রক্ষা করা, আর কিছু নয়।

কেন তোমার ছেলে স্বাভাবিক হ'বে না? তোমরা সুস্থ স্বাভাবিক বাপ-মা, তোমাদের ছেলে স্বাভাবিক হ'বে বই কি। একখানি ভালো বই পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে, পড়ে দেখো, তা' হ'লেই বুঝ্‌বে স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক সন্তান হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না। ইতি।

তারপর আরও ক'মাস কেটে গেল। মাঘ মাসের শেষের দিকে মণিমালার একটি খোকা হ'ল। শোভন মণিকে বাপের বাড়িতে না পাঠিয়ে বুদ্ধি ক'রে নার্সিং হোমে পাঠিয়েছিল। একমাস আগে থাক্‌তেই সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমি খুব খুসি হয়েছিলাম কিন্তু মণির মা খুড়িদের ব্যবস্থাটা আদৌ পছন্দ হয় নি।

এই সময় মণিকে লিখেছিলাম—"ঠিক কথাই বলেছে শোভন। বিলেতে কারো ছেলে হ'বার আগে তার খাট পালঙ্ক, কাপড় চোপড়, ন্যাড়া মাথা আঁচ্‌ড়াবার জন্য কচি বুরুস্‌, পাউডারের কৌটো, গরম মোজা, গায়ের শাল, সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে, ঘষে মেজে মন্দির সাজানোর মত করে রাখা হয়। আর আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই বারান্দার কোনায় কি উঠোনের পাশে অন্ধকার আঁতুড়-ঘরে ছেলে জন্মায়, সেখানে কেউ গেলে তাকে স্নান করতে হয়, শিশুর ব্যবহারি জিনিস অশুদ্ধ হয়, আর বাড়িতে মানুষ ম'লে যেমন অশৌচ হয় প্রায় সেই রকম অশৌচ হয়। আজকাল এসব কমে গেলেও, খানিকটা খানিকটা তোমার বাপের বাড়িতেও আছে।

আমার ত' মনে হয় শোভন ভালো ব্যবস্থা করেছে, আর তুমিও যে কাপড় জামা তৈরী করেছ, তা'তে আমি খুব খুসিই হয়েছি।"

যাই হোক্, মণির যে কি সুন্দর ছেলে হ'ল সে আর কি বল্‌ব। একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না, আমার এতগুলো ছেলেপুলে নাতি-নাত্‌নী হয়েছে, সত্যি বল্‌ছি, মণির ছেলের ধারকাছ দিয়েও কেউ যায় না। যেমন দেখ্‌তে সুন্দর—কি রং সে আর কি বল্‌ব—সেই রকম স্বাস্থ্য আর ঠাণ্ডা মেজাজটি। ওর দাদামশায়ের ওকে দেখে শেখা উচিত, সে আমার নিজের ছেলে হ'লেও একথা বলতে আমি বাধ্য। সারাটি রাত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, সারাদিন লক্ষ্মী হয়ে খায়-দায়, জাগে, ঘুমোয়। আমার নাত্‌নীর ছেলে বলে বল্‌ছি না, সত্যিই আমি অমনটি আর দেখি নি। মণি বাড়ি গেলে পর, ওর মা এসে মাস-খানেক ওর কাছে ছিলেন। সেই সময়ে মণিকে লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

ভালোই হয়েছে তোমার মা এসে রয়েছেন। সংসারের ঝামেলার হাত থেকে কতকটা রক্ষা পাবে তুমি, শরীরটা তা' হ'লে শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে। কিন্তু একটা বড় ভাবনা হয়, নার্সিং হোমে খোকন বেশ খাটে শুয়ে থাক্‌ত, কান্নাকাটি করত না, তোমার মা যা' ছেলেপুলে নাড়া-চাড়া করতে ভালোবাসে, কোলে নিয়ে নিয়ে না অভ্যাস খারাপ করে দেয়। তোমার বাবা যখন ছোট ছিল তা'র পাঁচ পিসিতে আর এগারোজন দিদিমা ঠাকুমা সম্পর্কের লোক মিলে তা'র এমনি অবস্থা দাঁড় করাল, যে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত কোলে না নিলে ছেলে ঘুমোত না। এখন পর্যন্ত ঘুমোবার সময় কেউ যদি

চুলে বিলি কেটে দেয়, হাত পা টিপে দেয়, কেমন খুসি হয় দেখ নি? তোমার মা যদি তোমার ছেলের ঐ রকম অভ্যাস ক'রে দিয়ে, নিশ্চিন্তমনে বাড়ি চলে যান, তখন তোমাকে একা কষ্ট পেতে হবে কিন্তু। কারণ শোভন যত ভালো স্বামীই হোক্ না কেন, সে যে ছোট ছেলেপুলে কোলে নিতে রেগুলার ভয় পায়, এটা আমি খুব লক্ষ্য করেছি। কাজেই নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর রাখবে দিদিমণি, বিশেষ করে তোমার মা-খুড়ীরা যদি তোমার সাহায্যে আসেন। ইতি।

ঠাকু'মা।

আমার মণিমালার কথা আমি আর বলে বলে শেষ করতে পারি না কিন্তু এদিকে আমার চিঠির ঝাঁপি শেষ হয়ে এল, তলায় যে ক'খানি চিঠি পড়ে আছে, তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে দু'চার-খানি শুনিয়ে আমি বিদায় নিই। আমি জানি আমার মণিমালার মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যাবার মত কিছুই নেই, সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের অতিশয় সাধারণ মেয়ে সে, তার মত মেয়ে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে রয়েছে। তাই মনে হয়েছিল হয় ত' বা এদেরও সাম্‌নে মণিমালার সারা জীবনের ছোটবড় সমস্যাগুলো দেখা দেয়; তাই যদি হয়, তা' হ'লে মণিকে যে সব চিঠি লিখেছিলাম, সেগুলি দেশজোড়া হাজার হাজার নাত্‌নীদেরও কাজে লাগ্‌তে পারে। এতখানি আশা করে যে সব কথা মণি আর আমি ছাড়া কেউ জান্‌ত না, সে সমস্ত সকলের সাম্‌নে প্রকাশ করলাম।

আমার মণিমালা তার স্বামী, ছেলে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছে। এখন তার বুড়ো শ্বশুরও অসুস্থ হ'য়ে ওদের কাছে দু'মাস রয়েছেন। মণির আর কাজের অন্ত নেই, এমন কি বাড়ি থেকে বেরোন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার নাতনীর মত সুখী কজনাই বা আছে! কিছুদিন আগে তা'কে লিখেছিলাম—

স্নেহের মণি,

তোমার মা মনে করেছেন বুঝি তুমি বড় দুঃখী, কারণ তুমি আজকাল আমোদ-আহ্লাদের সময় পাচ্ছ না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে তোমাকে নইলে যখন তোমার সংসারের কারো চলে না, এক ঘণ্টার জন্যও চলে না, তখন তোমার মত সুখী কেউ নেই। দেখ মণি, বুড়ো হ'বার একটা মস্ত বড় দুঃখ হচ্ছে যে সাধারণতঃ বুড়োদের দিয়ে আর কারো কোনও দরকার থাকে না। দু-একজনা মহা-মানব ছাড়া, বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের কতটুকুই বা কাজ করবার সাধ্য থাকে? সেইজন্য মনে হয় বেশী বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকা ভালো নয়। কিন্তু তোমার জীবনের যে প্রতিটি মুহূর্ত, কারো না কারো কাজে লাগছে ভেবে আমার কত যে আনন্দ কত যে গর্ব হচ্ছে বল্‌তে পারি না।

জীবনটাকে সার্থক ক'রে নাও দিদিমণি; গতবার সখ মেটাবার প্রয়োজনের কথা বলেছিলাম, কিন্তু জীবনের সার্থকতা হয় কাজ দিয়ে, শুধু সাজাগোজা খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো-কুড়োনো দিয়ে নয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে মেয়েরা কখনও একজনও রুগীর সেবা করে নি, বা একজনও শিশুকে শিক্ষা দেয় নি, বা একটাও

গাছ পোঁতে নি, তা'দের জীবনের অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে। দিদিমণি, কতকগুলো পুরোন নিয়ম আছে যা'র মূল্য কখনও কমে যায় না, দুর্বলকে, নিরাশ্রয়কে, দুঃখীকে কখনও ফিরিয়ে দিও না। তা' হ'লে সুখ তোমাকে খুঁজে বেড়াতে হ'বে না, সুখ নিজে এসে তোমার অন্তঃকরণে বাসা বাঁধবে। তোমার বুড়ো শ্বশুরের তুমি সেবা করছ শুনে আমার এত আনন্দ হ'ল যে কত লম্বা একখানি চিঠি লিখে ফেল্‌লাম দেখেছ? ইতি।

এ দুনিয়াতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি আর হয়? মণিমালার সুখের জীবনেও মাঝে মাঝে ছোটখাট খিটিমিটি মন কষাকষি লাগত, এমন কি শোভনের সঙ্গেও লাগ্‌ত, যেমন আর পাঁচজনা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে লেগে থাকে। বলেছি ত' মণি আমার কোনও বিষয়েই অসাধারণ নয়। তাই একবার মণিকে লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

বুকের মধ্যে সত্যকথাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখবে, কিন্তু তাই বলে যখন তখন টপাটপ নির্জলা সত্যকথা, অর্থাৎ যাকে বলে "স্পষ্ট কথা" ব'লে আবার যেন লোকের মনে কষ্ট দিয়ো না। কারণ দিদিমণি, কেবলমাত্র তখনই লোকের মনে কষ্ট দেওয়া যায়, যখন ঐ কষ্ট পাওয়ার ফলে, তার বা অপর কারো মঙ্গল সাধন হয়। তা' যদি না হয় তবে স্পষ্ট কথা বলাটা কেবলমাত্র নিষ্ঠুরতা হয়ে দাঁড়ায়। আর পৃথিবীতে যত রকমের পাপ আছে তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা সব

চেয়ে অধম। আমি অনেক সময় দেখেছি একজন মুখরা মেয়ে একটা গোটা সংসারকে তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিতে পারে। কারণ মনের শান্তির চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই; আর ঐ যা'কে মুখরা মেয়েরা "স্পষ্ট কথা" বলে, অনেক সময়ই সে আর কিছু নয় শুধু মনের ঝাল মেটানো, নিজের মনে শান্তি নেই ব'লে অপরের মনের শান্তিও নষ্ট ক'রে দেওয়া।

তবে মাঝে মাঝে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'লে স্পষ্ট কথা বলা দরকার হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তখনও যেন ব্যক্তিগত শ্লেষ এসে ন্যায় যুক্তিকে বিষাক্ত ক'রে না তোলে। অনেক সময় একটা ছোট অবিচারকে বাড়তে দিলে, শেষটা সে এমন বিরাট আকার ধারণ করে যে তখন তাকে রোধ করতে গেলে, সংসারটাই উলট্‌ পালট্‌ হয়ে যায়। তার চেয়ে সময় থাক্‌তে দু'চারখানি স্পষ্ট কথা ব'লে, গোড়া থেকেই তাকে বন্ধ ক'রে দেওয়া অনেক ভালো। অনেক মেয়েরা আবার অপরের উপর অন্যায় হ'লে প্রতিবাদ করে, কিন্তু নিজের উপর অন্যায় বা অবিচার হ'লে, সেটাকে সহ্য করাকে পরম নিঃস্বার্থপরতা ব'লে মনে করে। অন্যায় সব সময় অন্যায়, সে যা'র উপরই হোক্‌ না কেন। কেবলমাত্র তখনই অন্যায়কে গ্রহণ করা যায়, যখন তার প্রতিবাদ করতে গেলে আরেকটা আরও বৃহৎ অন্যায় বা অশান্তি হ'বার আশঙ্কা থাকে। বাড়ির কর্তা বা গৃহিণী যদি বিষম রাগী হ'ন, তা' হ'লে অনেক সময় এই রকম একটা পরিবেশ রচনা হয়, তখন পারিবারিক শান্তির জন্য ছোট অন্যায়টা না মান্‌লেও হজম করে নিতে হয়।

কিন্তু তোমার ত' রাগী মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হয় না দিদি-মণি। যেমন রাগী ছিলেন আমার শ্বশুরমশায়,—এখন স্বর্গে গেছেন, অনেক গুণও ছিল,—ঠিক তেমনি রাগী ছিলেন তাঁর পিতৃদেব।

তু'জনে যদি একসঙ্গে রেগে যেতেন সে এক বিরাট ব্যাপার হ'ত। নিমেষের মধ্যে ছেলেপুলে চাকরবাকর হাওয়া হ'য়ে যেত, কে যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যেত তার ঠিক নেই। আর আমার দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ী আর আমরা তিন বৌ যে যেখানে থাকতাম সুড় সুড় করে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকে কালা বোবা সেজে কাজে লেগে যেতাম আর বেরোতাম না। শেষ পর্যন্ত কাউকে না পেয়ে রেগে গর্জন করতে করতে যখন তাঁরা রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছতেন, তখন আমার দিদিশাশুড়ী খুন্তি হাতে এমনি অগ্নিমূর্তি ধরে বেরিয়ে আসতেন যে তখুনি তাঁদের তর্জন গর্জন ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত। অথচ তাঁরা তু'জনেই যে অতিশয় স্নেহশীল মানুষ ছিলেন, আমি তা'র শত শত প্রমাণ পেয়েছি। দিদিমণি, তুমিও সেই বংশের মেয়ে। রাগকে চিত্তে স্থান দিও না, রাগ হওয়ামাত্র তা'কে মন থেকে ঝেড়ে ফেলো, কারণ রাগকে যত প্রশ্রয় দেবে, রাগ ততই তোমাকে পেয়ে বসবে ; শেষ পর্যন্ত তুমি রাগের ক্রীতদাসী হয়ে পড়বে। তাই মানুষের ষড়-রিপুর মধ্যে রাগকেও ধরা হয়। রাগী মানুষের শত গুণ থাকলেও নিজের পরিবারের ও প্রিয়জনদের সে বড় তুঃখ দেয়। দোহাই দিদিমণি, সহজে রেগো না, কিন্তু সকলকে এটুকু জানতে দিও যে অন্যায়কে তুমি সহ্য করবে না। ইতি।

ঠাকু'মা।

আরও কত যে চিঠি লিখেছিলাম মণিমালাকে নিজেরই পড়ে অবাক লাগে। একবার লিখেছিলাম—

দিদিমণি,

নিন্দুক হ'য়ে যেও না। একজনের কথা আরেক জনকে ব'লে দিও না। পরোক্ষ ভাবেও অশান্তির কারণ হ'য়ো না। যে যা বলে শুনে যেও, ভুল বল্‌লে প্রতিবাদ ক'রো: কাউকে সাবধান করে দেওয়া দরকার হ'লে তাও দিও; কিন্তু কদাচ এক জায়গায় একজনের নিন্দা শুনে গেলে সে বিষয়ে মুখ খুলো না। তোমার ব্যবহারে কেউ যেন দুঃখ না পায়। ইতি।

মণিমালার খোকা যেমন একটু বড় হ'ল, তাকে নিয়ে আবার কতরকম যে সমস্যা উঠ্‌তে লাগল তা'র ঠিক নেই। ছেলেকে জোর করে বিট-গাজর খাওয়ানো উচিত কি না, ছেলেকে নিজের হাতে কাজ করতে বাধ্য করা উচিত কি না, তাকে কোলে নিয়ে আদর করা হবে কি না, তার সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও আধো আধো কথা বল্‌বে কি না, এই সব প্রশ্ন নিয়ে ছেলের মা-বাবা পিসি মাসি দিদিমারা সব ভেবে আকুল হ'য়ে গেল। আমি মণিকে তখন একখানি চিঠি লিখেছিলাম —

দিদিমণি,

ছেলেমেয়ে মানুষ করা এমন একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক জিনিস যে তাই নিয়ে আর পাঁচজনে মিলে কমিটি ক'র না। ছেলের কি কি খাওয়া উচিত আর কি খেলে তার শরীর খারাপ হবে

জেনে নিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে, তার মধ্যে যেটা তার ভালো লাগ্‌বে সেটা তাকে দিতে চেষ্টা কর, প্রয়োজন হ'লে রাশভারীও হয়ো। তবে মার-ধোর ক'র না। কারণ তুমি যখন স্কুলে পড়াতে গিয়েছিলে তখন তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে হয় ত', যে শিশুকে মারা মানে বাহুবলের কাছে বুদ্ধির পরাজয় স্বীকার করা। ছেলে দুষ্টুমি করলে, তার অনুযায়ী শিক্ষা দিও। কিন্তু ক্রমাগত যদি মারো, তার সুবুদ্ধি কোন দিনও খুল্‌বে না। কাজেই পারত পক্ষে ছেলের গায়ে হাত তুলো না। তা'তে তা'কে অপমান করা হয়, আর ছোট ছেলেরও যদি আত্মসম্মান নষ্ট ক'রে দাও, তা'হ'লে তার আর কিছু থাকে না।

মোট কথা পাঁচজনে মিলে একটা আলোচনাসভাও ক'র না, আর কোথায় কোন্ বিদেশে কোন্ মনস্তত্ত্ববিদ্ কোন্ অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলেছেন তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, শেষটা যেন দড়ি দেখে সাপ বলে ভুল ক'র না। জন্তুজানোয়াররাও উপযুক্ত করে বাচ্চা পালন করে, আর মানুষের বেলাই পাঁচজন পরামর্শদাতার প্রয়োজন, তা কি কখনও হ'তে পারে?

তোমার ছেলেকে তুমি মানুষ ক'র। যদি কোথাও খট্‌কা লাগে শোভনের সঙ্গে পরামর্শ ক'র, বাইরের লোক ডেকো না। ছেলে যেন তোমার উপর বিশ্বাস না হারায়।

আর তা'র সামনে, তার নামে কদাচ শোভনের কাছে নালিশ ক'র না। তা' হ'লে আর তার তোমার কথা শোনা উচিত হবে না। নালিশ ক'র না, পরামর্শ নিও। ইতি।

ঠাকু'মা।

মণিমালা ছেলের নাম রাখ্‌লে রাহুল, মণির মার নামটা তত পছন্দ হয় নি। তার ইচ্ছা ছিল নন্দন বলে ডাকা হয়। শোভনের বাবার ততদিনে শরীরটা একটু সেরেছে, তিনি বল্‌লেন নন্দন নাম রাখ্‌লে ছেলে মেয়েলী হ'য়ে যাবে, বাব্‌রি চুল রাখ্‌বে, কুকুর দেখলে ভয় পাবে, বাঁশি বাজাবে এবং সম্ভবতঃ নাচেটাচেও যোগ দেবে। শেষ পর্যন্ত রাহুল নাম রাখা হ'ল। আমার মত চাওয়াতে আমি লিখেছিলাম—

স্নেহের মণিমালা,

বেশ ত' রাহুল নামই রাখা হোক্‌। তোমার শ্বশুরের যখন এত পছন্দ। তবে কি না নামের যে কোনও ম্যাজিক গুণ আছে যা' দিয়ে ছেলের স্বভাব বদ্‌লে যেতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। তোমার ছেলের যদি মেয়েলী স্বভাব হয় তা' হ'লে তার বীরভদ্র নাম রাখ্‌লেও তাই হবে। আর আমাদের দেশের বিখ্যাত রঘু ডাকাতের ত' রামচন্দ্রের নামেও কোনও সুবিধা হয় নি।

তোমাকে আমি বলেছি যে আধ্যাত্মিক শক্তি অস্বীকার না করেও, সরল সুবুদ্ধি দিয়ে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া ভালো। তা' ব'লে কোনও রকম কুসংস্কারকে স্থান দিও না। আমাদের সাংসারিক জীবনে যেটাকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে গেলে ভেঙ্গে পড়ে, সেটা অচল হওয়া উচিত। কাজেই নীলা পরলে সর্বনাশ হবে, এ আমি মানিই না। নীলা না পরেও যখন বহুলোকের সর্বনাশ হয়, আর নীলা পরেও যখন কারো কারো কিছু হয় না, তখন কেমন করে মানি

বল? তবে ধাতুর দ্রব্যগুণ থাকতে পারে, জানি না। যাই হোক্ মাদুলীটাদুলীর উপর নির্ভর না ক'রে স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ নিয়মগুলো মেনে চ'ল, তা' হ'লেই তোমার ছেলের স্বাস্থ্য ভালো থাক্‌বে।

তারপর ঐ যে ওর পিসিমা দৃষ্টি লাগার কথা বলে গেল, ও জিনিস আমি মানি না। মান্‌লে, এ কথাও মেনে নেওয়া হ'বে যে সর্বমঙ্গলময় ভগবানের চেয়ে ঐ দৃষ্টির বেশী ক্ষমতা। একথা মান্‌তে আমি কিছুতেই রাজী নই। ছেলেকে আগ্‌লে রাখ্‌বে বই কি, তবে সত্যিকারের বিপদের হাত থেকে। তার কোনও জন্মদুঃখিনী পিসিমার স্নেহের চোখ থেকে যে তার অনিষ্ট হ'তে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। ইতি

ঠাকু'মা

এবার আমার চিঠির ঝাঁপি সত্যি সত্যি ফুরিয়ে গেল। নীচে একখানি মাত্র চিঠি পড়ে আছে, সেইটি আপনাদের শুনিয়ে, মণিকে

লেখা চিঠিগুলি মণিকেই দিয়ে আস্‌তে হ'বে। সেই বারো বছর বয়স থেকে বুড়ো ঠাকু'মার লেখা চিঠিগুলি কেমন যত্ন করে সে তুলে রেখেছে, নইলে আর আমি কোথায় পেতাম। এ চিঠিখানি মাস-কয়েক আগে লিখেছিলাম।

স্নেহের দিদিমণি,

শুন্‌লাম তোমার আদর যত্নের জন্য শোভনেতে আর রাহুলেতে বিষম রেষারেষি লেগে গেছে? এটা কেমন ক'রে হ'ল? শোভন যখন কাজ সেরে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি আস্‌বে, তুমি তখন রাহুলের খাওয়া দাওয়া কাপড় ছাড়া শোয়ার তদারক করতে পাবে না। ওগুলির আগে থাক্‌তেই ব্যবস্থা করে রাখ্‌তে হ'বে। তারপর রাহুলের জন্য শোভনের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কোথাও বেরোবে না, এও তোমার উচিত হচ্ছে না, দিদিমণি। যতদিন তোমার শ্বশুর অসুস্থ ছিলেন, ততদিন অন্য কথা, এখন তোমার ভালো লোকজন রয়েছে, সন্ধ্যা হ'তেই যা'তে ঘুমোয় তার বন্দোবস্ত করে, তুমি বেরোবে বই কি! তোমার সঙ্গ যে সে চাইছে এটা তো তোমার সৌভাগ্য। যদি সে দিনের পর দিন তোমাকে ফেলে একা বেরিয়ে যেত, তা' হ'লে কি তুমি খুব খুসি হ'তে? যখন সংসার করছ, এটাও দেখবে, দিদিমণি, যেন প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রাপ্যটুকু পায়। কাউকে বঞ্চিতও ক র না,

আবার কাউকে অতিরিক্ত দিয়ে দিয়ে তার অভ্যাসও খারাপ করে দিও না।

তুমি জানতে চেয়েছিলে সব চাইতে কঠিন কর্তব্য কী। সেটি হ'ল তোমার ছেলেকে মা ছাড়া চলতে শেখানো। যদি তুমি একদিন না-ই থাক, তখন যেন তোমার ছেলে অগাধ জলে না পড়ে।

আশীর্বাদ করি, দিদিমণি, তুমি দীর্ঘকাল তোমার স্বামী ছেলে নিয়ে সুখে বেঁচে থাক। আর আমিও যে ক'টা দিন আছি, তাই দেখে যেন আমার চোখ জুড়োই। ইতি।

ঠাকু'মা।